সাহিত্য-রত্ন।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এ.

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

তৃতীয়-সংস্করণ।

SAHITYA-RATNA.

SATIS CHANDRA SEN-GUPTA, B.A.,

SUPERINTENDENT, METROPOLITAN INSTITUTION.

Formerly Prefect, Morton Institution; Headmaster, Metropolitan Institution, Bowbazar Branch; Superintendent and Senior Teacher of English, Central Collegiate School; Author of "Golden Book of English Verse," etc.

SEN, ROY & Co.,

BOOK-SELLERS AND PUBLISHERS,

Cornwallis Buildings, Calcutta.

Price ~~Fourteen Annas~~

প্রকাশক
শ্রীসরোজকুমার সেন, বি-এল্
সেন রায় এণ্ড কোং
কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা।

২৯ নং কালিদাস সিংহের গলি, কলিকাতা;
"ফিনিক্স যন্ত্রে"
এস, সি, চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

"সাহিত্য-রত্ন" বঙ্গদেশের সকল বিভাগেই ডিরেক্টর্‌মহোদয়কর্তৃক ম্যাট্রিকিউলেশন্ বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইয়াছে।

যে সাহিত্যাচার্য্যগণের রচনা সাহিত্য-রত্নে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাঁহাদের মহানুভবতার ঋণ স্বীকার করার সামর্থ্য বা ভাষা আমার নাই।

সহৃদয় ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমহোদয়গণের অনেকের নিকটেই "সাহিত্য-রত্ন" সমাদর লাভ করিয়াছে। এই সদাশয়তার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা,
১৩ই পৌষ, ১৩২৬।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বিষয়-সূচী।

বিষয় — লেখক — পত্রাঙ্ক।

চিত্রদর্শন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১

শকুন্তলাবিদায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৮

[illegible]শিলা—অক্ষয়কুমার দত্ত ১৪

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য—কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৭

ভাগ্যগণনা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৫

সাগরসঙ্গমে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০

উপকূলে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৪

সন্তানের শিক্ষা—ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩৮

বীরত্বে কাতরতা—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪৪

কীটাণু—অক্ষয়কুমার দত্ত ৫০

জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৫৫

সাধারণের উন্নতি—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৫৯

সীতাপতি গোস্বামী কে?—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬৩

বাল্মীকির জয় (১)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬৭

বাল্মীকির জয় (২)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭২

চরিত্র—রজনীকান্ত গুপ্ত ৭৬

পল্লীগ্রামে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০

রামায়ণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৪

বিষয় লেখক	পত্রাঙ্ক।
ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য—রজনীকান্ত গুপ্ত ...	৮৮
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—শিবনাথ শাস্ত্রী ...	৯৫
শ্মশানে—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	১০২
পৃথিবীর বয়স—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১৪
সীতা—যোগীন্দ্রনাথ বসু	১২১
মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ—শশধর রায়	১২৬
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
হৃষীকেশ—জলধর সেন	১৩৭
পরিশ্রমের মর্য্যাদা—	১৪৩
ইউরোপে সারাসেন্ সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	১৫০
বন ও বৃষ্টি—জগদানন্দ রায়	১৫৬
নিশীথে আগন্তুক—রমেশচন্দ্র দত্ত ...	১৬১
সাগরিকা—অক্ষয়কুমার মৈত্র	১৬৬
লক্ষ্মণ—দীনেশচন্দ্র সেন	১৭২
কিরীটেশ্বরী—নিখিলনাথ রায়	১৭৯
মনসুরের তত্ত্বজ্ঞান লাভ—মোজাম্মল হক্	১৮৫
ধর্ম্ম-সঙ্গীতি—চারুচন্দ্র বসু	১৮৯

সাহিত্য-রত্ন।

চিত্র-দর্শন।

লক্ষ্মণ আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে কহিয়াছিলাম, সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম কহিলেন, বৎস! দেবী দুর্ম্মনায়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত।

রাম শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ওকথা মুখে আনিও না; ওকথা শুনিলে অথবা মনে হইলে, আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্ম-পরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোক-রঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা কহিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্ক স্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদ বিমোচন হইত না। সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া,

রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আর ও কথায় কাজ নাই; এস আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ওসকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ বেদরক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ঐ সকল তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। পরম দয়ালু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাড়কা-নিধন-কালে আমাকে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এদিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! আবার, এদিকে বিবাহ-কালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি! শুনিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন,

বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তা-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যাগমন-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; আর এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য, তাঁহার দর্প সংহার করিবার নিমিত্ত, ধনুখানে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্ম-প্রশংসাবাদ-শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য কহিলেন লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের ও উৎসবের দিনই গিয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নাম শ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া কোনও উত্তর না দিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরুতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এদিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,

ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন; কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ আমাদিগকে চিত্রকূট যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত সঞ্চরমান জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ

করিতেন, গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দগমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাতে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ সমীরণ সেবা করিতাম। হায়। তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে। এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া ম্লানবদনে কহিলেন, হা নাথ। এই পর্য্যন্তই দেখা-শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে। এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য। চিত্র দর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার নিশাচরেরা হিরণ্ময় মৃগের ছলে যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈর-নির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থানভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণ-মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়। এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনিও এত অভিভূত হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্র দর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ

হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর সম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য। এদিকে দণ্ডকারণ্য ভূভাগ অবলোকন করুন। এই দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দ-শ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা রমণীয় সরোবর, আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম প্রফুল্ল কমল সকল, মন্দমারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, উহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে, মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারি-বিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই, এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদগত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম তাহাতেই কেবল একবার অস্পষ্ট অবলোকন করি।

সীতা, চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টিসংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় মদমত্ত ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণ কলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্, মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরসংযোগে শিখর-

দেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না। শুনিয়া আমার শোক-সাগর অনিবার্য্যবেগে উথলিয়া উঠিতেছে! জানকীর বিরহ পুনর্ব্বার নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্য-লক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য। আর চিত্র দর্শনে প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তি বোধ হইয়াছে; এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শকুন্তলা-বিদায়।

প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—'অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য, আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।' পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন,—'বৎসে। বেলা হইতেছে প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল-হরণ করিতেছ কেন?' এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা অনুমতি কর।'

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া প্রিয়ম্বদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিতে লাগিলেন—'সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।'

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রিয়ম্বদা কহিলেন—'সখি! তুমি যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইয়াছে দেখ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে, কোকিল-কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিতেছে।'

কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়।' তখন শকুন্তলা কহিলেন—'তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না।' এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন—'বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম।' অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন—'সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম।' তাঁহারা কহিলেন—'সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিলে, বল?' এই বলিয়া শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন—'অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!'

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন—'তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলিবে না বল?' কণ্ব কহিলেন—'না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।'

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল! শকুন্তলা,

'আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে,' এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতি-পালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদী তৈল দিয়া ব্রণ-শোধন করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে।' শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন—'বাছা! আর আমার সঙ্গে কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম, এখন আমি চলিলাম অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।' এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।'

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভগবন্! আপনার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন।' কণ্ব কহিলেন—'তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই।' অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন—"বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে—'আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই শকুন্তলা বন্ধুগণের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতে স্নেহ-দৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত

প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।' "

কণ্ব, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—' বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলাচারিণী হইবে না। মহিলারা এইরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হন, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক স্বরূপ।' ইহা কহিয়া বলিলেন—' দেখ গোতমীই বা কি বলেন?' গোতমী কহিলেন—' বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক?' পরে শকুন্তলাকে কহিলেন—' বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।' "

এই রূপ উপদেশ-প্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন— ' বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীগণকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—' অনসূয়া, প্রিয়ম্বদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক।' কণ্ব কহিলেন—' না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।' শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন—' তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণ-ধারণ করিব!'—এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—' বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া

গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না।' শকুন্তলা পিতার চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন—'তাত! আবার কতদিনে এই তপোবনে আসিব?' কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতিসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তিরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।'

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন—'বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার সময় বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় কহিয়া লও, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না।' তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন—'সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর।' উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন—'সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।' শকুন্তলা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন—'সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে।' সখীরা কহিলেন—'না সখি, ভীতা হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।'

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় হইয়া শকুন্তলা, গোতমী-প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দুষ্মন্তরাজধানীপ্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন! ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

কহিলেন—‘ অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর।’ এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে করিতে লাগিলেন—‘ যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।’

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

হিমশিলা।

জল শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয়, ইহা সকলেই বিদিত আছে। সাধুভাষায় বরফের নাম হিম-শিলা বা তুষার-শিলা। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি হিম-প্রধান জনপদের নদী, হ্রদ, সরোবরাদি জমিয়া এমন কঠিন হয় যে, লোকে তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। কোন কোন প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রবর্ণ দেখায়। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, এই নিমিত্ত ঐ উভয় প্রদেশ বরফে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর মহাসমুদ্রে ও দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত বরফ-রাশি এত উচ্চ ও এত প্রশস্ত যে, লোকে সে সমুদায়কে বরফের দ্বীপ ও বরফের পর্ব্বত বলিয়া উল্লেখ করে। সেই সকল ভয়ঙ্কর স্তূপাকার বরফের মধ্যে পতিত হইয়া, অনেক অর্ণবযান, নাবিক ও মাল্লাগণ-সম্বলিত, নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৭৭৩ সতর শত তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরে জগদ্বিখ্যাত কুক্ সাহেব দক্ষিণ মহাসমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড বরফ-রাশির সম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার উচ্চতা প্রায় ৩৩ তেত্রিশ হাত, বেড় প্রায় ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত হাত। সেই দিবস অপরাহ্ণে, তিনি আর একটা পর্ব্বতাকার বরফ-রাশি-সমীপে উপস্থিত হন, তাহার দৈর্ঘ্য ১,৩৩০ এক হাজার তিন শত ত্রিশ হাত, প্রস্থ প্রায় ২৬০ দুই শত ষাট্ হাত এবং বেধও ন্যূনাধিক ১,৩৩০ এক হাজার তিন শত ত্রিশ হাত।

বেফিন বে নামক সমুদ্র-খণ্ডে ন্যূনাধিক ১ এক ক্রোশ দীর্ঘ অনেক অনেক বরফ-রাশি দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসমুদায়ের উপরিভাগে

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

মন্দিরের চূড়ার তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট ন্যূনাধিক ৭০ সত্তর হাত উচ্চ ভূরি ভূরি বরফ-রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রের এক এক স্থান এত দূর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত যে, বড় বড় গুণবৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া দেখিলেও, তাহার প্রান্তভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না।

সমুদ্র জমিয়া কঠিন হওয়াতে, গ্রীনলণ্ড-নিবাসী 'এস্কিমো' নামক লোকেরা তাহার উপর গমন করিয়া মৎস্যাদি জল-জন্তু সকল ধরিয়া আনে। বরফ মৃত্তিকা অপেক্ষা মসৃণ, এ প্রযুক্ত রুষ, লাপ্‌লণ্ড কেনেডা প্রভৃতি শীতল প্রদেশীয় লোকেরা এক প্রকার চক্রহীন শকট আরোহণ পূর্ব্বক বরফের উপর দিয়া অতি দ্রুত গমনাগমন করে।

এই সমস্ত পর্ব্বতাকার বরফ-রাশি সহজেই ভয়ানক, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে তাহারা পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া অতিশয় ভীষণ শব্দ উৎপাদন করে। সে শব্দ এরূপ প্রচণ্ড যে, তৎকালে তথায় অন্য কোন প্রকার শব্দ কর্ণগোচর হয় না। স্থানে স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া যেমন ঐ সমস্ত বরফময় পর্ব্বতের উপর প্রবলবেগে পতিত হয়, অমনি শীতে কঠিন হইয়া গৃহ, মন্দির-চূড়া, নগর প্রভৃতি অশেষ প্রকার বস্তুর আকার ধারণ করে, এবং ধারণ করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট জনগণের নেত্র-দ্বয় পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের পরম পরিতোষ সম্পাদন করে।

বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়। স্থানে স্থানে উহার উপর সূর্য্যের আভা পতিত হইয়া ধূমল পীতাদি অন্য অন্য মনোহর বর্ণও উৎপাদন করে। তখন উহা দেখিতে পরম রমণীয় ও অতীব আশ্চর্য্য হয়। কখন কখন উহার উপরে সূর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া তৎসন্নিহিত সমুদায় স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।

এই বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, যে সমস্ত সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় হিমশিলায় আচ্ছন্ন

থাকে, তাহাতে জীব-জন্তু কোন ক্রমেই বাস করিতে পারে না, সমুদায় জল-জন্তু নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর এ আশঙ্কার সম্যক্ নিরাকরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি হিম-শিলাকে জল অপেক্ষা লঘু করিয়া কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন! উহা অপেক্ষাকৃত লঘুতর হওয়াতে, জল-জন্তুগণের জলময় নিকেতনের ছাদ স্বরূপ হইয়া ভাসিতে থাকে, এবং তাহারা সেই তুষারময় ছাদের নিম্নভাগে অবস্থিতি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করে। তাহাদের শীতের প্রভাবে পীড়িত হওয়া দূরে থাকুক, মস্তকের উপর তুষার-শিলার আবরণ থাকাতে, উপরিস্থিত অতীব শীতল বায়ু তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য।

সমুদয় সভ্যগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলে, মহাত্মা মধুসূদন বর্ষাকালীন সজলজলদগম্ভীর-নিঃস্বনে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়; বীরপুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনাদিগের কুল, বিদ্যা-সদাচার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদয় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ আপনা হইতে, অযুক্ত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত ব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

"দেখুন, এই কুরুকুলের ঘোরতর আপদ্ সমুত্থিত হইয়াছে; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই আপদ্ বিনাশ করিতে পারেন; বোধ হয়, উভয়-পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরু-পাণ্ডবগণের সন্ধি আপনার ও আমার অধীন। আপনি

আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের হিত হইবে। আর বৈর নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান্ হউন; প্রাণপণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন্! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাম্বোজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও মহারথ যুযুৎসু, এই সমুদয় মহাবীরগণের সহিত কোন্ যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে অনায়াসে সমুদয় লোকের অধীশ্বরত্ব ও শত্রুগণের অজেয়ত্ব লাভ করিতে পারিবেন। কি সমকক্ষ, কি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল ভূপতিই আপনার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতা ও সুহৃদ্গণের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমুদয় পৃথিবী ভোগ করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। আপনি স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের উপার্জ্জিত ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

"হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয়-পক্ষের, কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট হানি হইবে;

পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী; তাঁহারাও আপনার আত্মীয়; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমুদয় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও বৃষ্ণিগণকে বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাদের পরস্পর বিনাশ-বর্জ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পবিত্রকুলসম্ভূত, বদান্য, অতি যশস্বী, লজ্জাপরবশ, মহাপ্রাজ্ঞ, পরস্পর মিত্রভাবসম্পন্ন কুরুপাণ্ডবগণকে এই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এই সকল ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করতঃ একত্র পান ও ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহার্দ্দ ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ হউক, আপনি সন্ধি সংস্থাপনে যত্ন করুন। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত, হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে, বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।

"হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক, প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন যে, 'আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা

প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি, এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ; আমরা আপনাকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতা-পিতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত, আমরা আপনার প্রতি সেইরূপ করিতেছি; আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন। আমরা উৎপথগামী হইলে, আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত করুন।'

"পাণ্ডবগণ সভাসদগণকেও কহিয়াছেন, 'ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সেস্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি সভাসদগণের সমক্ষে অধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম-স্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সমুদয় ভগ্ন করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম উক্তরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।'

"হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না; অথবা অত্রস্থ পারিষদগণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয় বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন।

হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদানপূর্ব্বক, পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সুখ-স্বচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ, উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহাকে দাহিত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন,—আপনার মর্য্যাদা কথনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি, আপনার মতানুসারে কপট দ্যূতে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি, সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

“আমি এক্ষণে আপনাদের উভয়পক্ষের মঙ্গলবাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি; আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।”

রাজা ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত, তাহা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বাধীন নহি। সুতরাং আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। সে গান্ধারী, ধীমান্ বিদুর বা ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্গণের হিতকর বাক্য

শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে।”

ধর্ম্মার্থতত্বজ্ঞ বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে, দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, “দুর্য্যোধন! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শান্তিবাক্য শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রাজ্ঞকুলে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, ও সদাচার প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ; অতএব সন্ধি সংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম। তোমার যেরূপ সঙ্কল্প, দুষ্কুলজাত নৃশংস নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিদের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থের অনুগত; অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার বারংবার নয়নগোচর হইতেছে; ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অধর্ম্ম, প্রাণ নাশের কারণ, অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন হওয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ পরিহারপূর্ব্বক আপনার, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্যগণের ও মিত্রগণের শ্রেয়ঃ সাধন কর; তাহা হইলে তুমি অধর্ম্মজনক অযশস্কর কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। আর এক্ষণে প্রাজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহানুভব, শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। তাহা হইলে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, পিতামহ বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি, জ্ঞাতিগণ ও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য মিত্রগণ সাতিশয় সুখী হইবেন। ফলতঃ সন্ধি সংস্থাপন হইলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। তুমি লজ্জাশীল, সৎকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদয়স্বভাব; অতএব পিতামাতার শাসনে অবস্থান কর। পিতার শাসনপরবশ হওয়া পুত্রের নিতান্ত শ্রেয়স্কর; দেখ মনুষ্যেরা বিপন্ন হইলে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া থাকে।

“ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার পিতার ও

অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত, এক্ষণে তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য না করে, যেমন মহাকালফল ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরিতাপিত হইতে হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হীনস্বভাবদিগকে সেবা করে, সে এরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হয় যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধু সুহৃদ্গণের বাক্যে উপেক্ষা, অনাত্মীয়ের সমাদর ও আত্মীয়-গণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, পৃথিবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কি নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট মূঢ়গণের সাহায্যে পরিত্রাণলাভে অভিলাষ করিতেছ? পাণ্ডবগণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা জাতক্রোধ হয়েন নাই। তুমি জন্মপ্রভৃতি সেই বান্ধবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ, তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক্ সন্তুষ্ট আছেন; অতএব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্ত্তব্য।

"হে দুর্য্যোধন! তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকলরাজবিখ্যাত অতিবিস্তীর্ণ অধিরাজ্যলাভে সমুৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ-দিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সে পরশু দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনাকে ছেদন করে। যে ব্যক্তির জয় ইচ্ছা করিতে হয়, তাহার মতিভ্রংশ করা একান্ত অবিধেয়। তুমি যে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়াছ, তাহারা কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, কি বিক্রমে, কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নহে। কেবল উহারা নয়, এই সমুদয় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে

কুপিত বৃকোদরের মুখ-সন্দর্শনে সমর্থ হইবেন না। এই সন্নিহিত সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ, ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না; অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ ত্যাগ কর।”

“পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এই সকল ভরতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়। যেন কৌরবগণের শেষ বিদ্যমান থাকে; তুমি কুল উচ্ছিন্ন করিও না। তুমি যেন নষ্ট-কীর্ত্তি ও কুলঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত না হও। মহারথ পাণ্ডবগণ, তোমাকে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।”

“অতএব এই আগমনোন্মুখী রাজলক্ষ্মীকে অবমাননা করিও না। সুহৃদ্‌গণের বাক্য-রক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া মহতী শ্রী লাভ কর, এবং মিত্রগণের প্রীতিভাজন হইয়া চিরকাল কুশলে অবস্থান কর।”

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ভাগ্য-গণনা।

এক পারে উদয়গিরি অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ-শোভিত, ধান্য বা হরিৎ ক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়। শিশু যেমন মা'র কোলে উঠিলে মা'কে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তি-গিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে "ইণ্ডষ্ট্রীয়ল্‌" স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়; এখন আমরা কুমারসম্ভব ছাড়িয়া "স্যুইন্‌বর্ণ" পড়ি, গীতা ছাড়িয়া "মিল্‌" পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি! আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া

হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ—সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল-পীতপুষ্পময় হরিৎ ক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক,—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে মসৃণ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য-পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ-সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হাতি-গুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই; ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্বপ্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি

সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী, শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব না বলিয়া তাহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন।

পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী, শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার একবর্ণও বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন,—বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। "এ স্ত্রী কে?"

সন্ন্যা। "পথিক।"

স্বামী। "এখানে কেন?"

সন্ন্যা। "ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।"

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দিতে বলিলেন,—"তোমার কর্কট রাশি।"

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম, শক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন,—"তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী। "শুনিয়াছি আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।"

স্বামী। "তুমি তাহা দেখিবে না বটে। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।"

শ্রী তা কিছুই বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল; আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল,—"আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। "তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।"

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। "কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?"

স্বামী। "এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?"

শ্রী। "পুরুষোত্তম দর্শনে যাইব মনে করিয়াছি।"

স্বামী। "যাও। সময়ান্তরে আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।"

স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কপালকুণ্ডলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাগরসঙ্গমে।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ এই দুই জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন, যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পারবি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে পিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সম্বাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে, পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর

মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।"

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ ভাবিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না।

বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহিব-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণজন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য-যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটী স্ত্রীলোক নৌকার মধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিলেন, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য-যাত্রী কোন মতে তাঁহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই, সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন,

স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,--সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্ত্তন করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে—এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চলরবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দ্দমনদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবে সৌভাগ্য এই যে উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ, মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ

সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপকূলে।

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে ;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে, আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব ; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরমধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘবৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে ;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না ; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না ; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভারবহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন, এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল ; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্যকাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাস-

কালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লুত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদশ্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রমদ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে

প্রত্যাবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশস্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া, যাত্রীরা নবকুমারব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাসনিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপ-কারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। **তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?**

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সন্তানের শিক্ষা।

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটি কোন পিতা মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করেন না। ইংরাজ আপনার ছেলেকে ইংরাজ করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপন সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনার জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন—কেহই মনুষ্য-সাধারণধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষা সম্পাদন করেন না। তবে যে সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনুযায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য-শিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষাপ্রণালী মনুষ্য-সাধারণ-ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতীয়ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ফলকথা তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে এই জন্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই মন পূর্ব্বপুরুষদিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আইসে। এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানব-মনের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না—জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না—ত্বক্‌সীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না—তেমনই জাতীয়-

ভাবপরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্যকর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্ব্বর, অর্দ্ধসভ্য, পূর্ণসভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেক অংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা, দুর্ব্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতনপ্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের অবস্থাভেদে সমাজের প্রয়োজন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে, এবং সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও কাজেই ভিন্ন রূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজনসাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদিগের সমাজ যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এইটি সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষাদান। মনুষ্যত্ব-সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি, এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটি প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া, কিরূপ হইলে ছেলেটি সমাজের অভাবমোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল-শরীর অতএব ছেলের

শরীর সবল করার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতামাতার কার্য্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ, কোন জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয়—তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা, দূরত্ব, নৈকট্য, সংখ্যা, ভার প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতামাতার কার্য্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনীশক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দুকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তিমাত্রেরই কারণশক্তির নাম স্মৃতি—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটি দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে—একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে কার্য্যকালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতামাতা সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনাশক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃত-

বাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতামাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটি সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য-বশতঃ, সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা-মাতার কর্ত্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। 'দুবেলা দুমুঠা খেতে পেলেই হইল,' এবম্বিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল; বাঙ্গালী সহজেই শ্রমবিমুখ। অতএব সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতা-মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদিগেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এইরূপ অনিয়মে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সহ্য হয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করিয়া থাকে। ঈর্ষা দোষটি সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বাগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষা যাহাতে প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় তাহাই চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষাবৃত্তি অযথারূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষসাধনের একটি প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক।

পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিস্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ-সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। এটি সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদিগের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল।

(১০) দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি, আমাদিগের সুখোপভোগচেষ্টা ভাল নয়। গান-বাজনা, আমোদপ্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরাজদিগের সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখা। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক।

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটি গল্প বলি।

একখানি জাহাজে এক জন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। এক দিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটি মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর এক জন বলিল, "তবে একথা কাপ্তেনকে বল না কেন?" সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়েপড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামী বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতি-কালেও ঐরূপ পাগলামী ছিল; রামায়ণ ও মহাভারতপাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামী জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভদিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না; অন্য জাতীয়ের বশ হয়। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা-মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটিকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বীরত্বে কাতরতা।

প্রতাপসিংহ সহসা মোগলসৈন্য আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রজনী বৃথা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ সসৈন্যে পুনর্বায় চাওন্দ দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মোগলসৈন্য ক্রমে ভীমচাঁদ ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজ্ঞী আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার খনিতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন! ভীমচাঁদের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া মোগলসৈন্য তথা হইতে চলিয়া গেল, মহারাজ্ঞী তখন জাউরার খনি হইতে বাহির হইয়া চাওন্দ-দুর্গে স্বামীর নিকট আসিলেন!

চাওন্দ-দুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল। সৈন্যের খাদ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যোদ্ধৃগণ হীনবল হইয়া আসিতেছে, চারি দিকে মেঘমালার ন্যায় শত্রুসৈন্যের শিবির দেখা যাইতেছে। এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপ-সিংহ পরামর্শ করিবার জন্য দুর্গের সমস্ত প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইলেন।

প্রতাপসিংহের চারি দিকে কুলপতিগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন-যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালাকুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন-কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারি দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সঙ্গী অনেকেই আর নাই। নব নব বালকগণ এখন কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহা-

রাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধ-ব্যবসায় শিখিতেছেন! অমরসিংহ যুদ্ধে পিতার সহযোদ্ধা, বিপদ ও সঙ্কটে ভাগগ্রাহী।

অনেকক্ষণ পর পরামর্শ শেষ হইল; ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল। বৃক্ষপত্র-বিনির্ম্মিত-পাত্রে সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্প বয়সেই শত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অমরসিংহ, এই ঘোর বিপদ্‌কালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য্য সাধন করিতেছ। কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।"

কিছু দূরে দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন, "চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের স্বামিধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন-পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজ-পরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য-বীর, কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।"

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া মহারাণা কহিলেন, "দেবীসিংহ! এ কাল-সময়ে তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামিধর্ম্মের পুরস্কার কি দিব? এ কাল-যুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র হারাইয়াছ, পরিবার কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছ, তথাপি খড়্গ-হস্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার সঙ্গী হইয়া ফিরিতেছ! প্রতাপসিংহ অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামিধর্ম্মরত যোদ্ধার এ অবস্থা দেখিলে প্রতাপসিংহের পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুলচূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মনুষ্য-সাধ্য নহে। অদ্য আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অনুগৃহীত কর।"

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ-যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু-মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "মহারাণা! কাতরতাচিহ্ন ক্ষমা করুন, বৃদ্ধের এক বিন্দু অশ্রু ক্ষমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ-বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক খড়্গ দিয়া শান্তিলাভ করিব, কিন্তু ভগবান অন্যরূপ ঘটাইলেন! ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীরনাম কলঙ্কিত করে নাই, এই বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না।"

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না, যোদ্ধৃদিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটি পর্ব্বত গহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজ-মহিষী রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্রকন্যাগণ উঠিলে খাইবে। প্রতাপসিংহ

দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, কলত্রপুত্র-দিগকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত বোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাহাকে আহার যোগাইত! কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রজনীতে স্বামি-পার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়াছেন, সহসা রাত্রিযোগে মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় কোন পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্য সহসা মিলে না, ক্ষেত্রের "মল" নামক দূর্ব্বার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে তাহারই রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুসন্তানকে

দিয়াছেন। এক দিন কন্দরবাসী একটি বন্য-বিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাত্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-হৃদয় কাতর হয় নাই।

কিন্তু অদ্য মহারাণার বীর-হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট-চিন্তা-রেখাঙ্কিত।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজ্ঞী রুটী রাখিয়া সত্বর স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দেখিলেন, স্বামীর চক্ষু জলপূর্ণ! বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি? অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা বলিবে, এত দিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন।"

প্রতাপসিংহ—"জগদীশ্বর জানেন, যুদ্ধে প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে।"

রাজ্ঞী—"তবে কি পুত্রকন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল?"

প্রতাপসিংহ—"জগদীশ্বর আমার পুত্রকন্যাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন। রাজ্ঞি! এই কাল-সমরে অনেক যোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছে, বৎস অমরসিংহের ন্যায় বীরপুত্র হারাইয়াছে, বীর-প্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে। রাজ্ঞি! এই কাল-যুদ্ধে অনেক যোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে।"

রাজ্ঞী—"ঈশানী তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন এইরূপ শোক মনুষ্যের অসহ্য।"

প্রতাপসিংহ—“রাজ্ঞি! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর-যোদ্ধা আমাদের যুদ্ধ-কার্য্যে কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা তুর্কীগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী-পরিবার চিতারোহণ করিয়াছে, তাঁহার একমাত্র বীরপুত্র তুর্কীহস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামিধর্ম্ম পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অদ্যাবধি জীবিত আছেন।”

রাজ্ঞীর নয়ন দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলে? দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে? দেবীসিংহ একমাত্র বীরপুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম!”

প্রতাপসিংহ—“বীরপুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, দুর্গ গিয়াছে, বংশ বিনাশ হইয়াছে! সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন, “ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর-নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীর-নাম কলঙ্কিত করিবে না।” এইরূপ স্বামিধর্ম্মের কি এই পুরস্কার? বীর অনুচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার রক্ষার কি ফল?”

অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রাজ্ঞী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শান্তি পাইলেন না, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “যদি রাজ্য-লাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজ-নামে জলাঞ্জলি দিবে!”

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

কীটাণু।

ঊর্দ্ধদিকে অসীম নভোমণ্ডলে নয়ন নিক্ষেপ করিলে, বিশ্বপতির বিশ্ব রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, যেমন বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, অধো-দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও মহীমণ্ডলবাসী প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাবধারণে সমর্থ না হইয়া, সেইরূপ চমৎকৃত হইতে হয়। গণ্ডার, মহিস, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃহৎকায় পশুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইতে হয়, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা নিতান্ত অসাধ্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীট পতঙ্গে পৃথ্বীমণ্ডল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নহে। তাহারা অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাণু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের বৃত্তান্ত যেমন আশ্চর্য্য, বোধ হয়, লোকপ্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস এবং কথাসরিৎসাগর বা আরব্যউপন্যাসের অন্তর্গত অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সমুদায়ও সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।

যখন আমরা অণুবীক্ষণ-সহকারে কীটাণুবর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন বোধ হয়, আমরা অখিলবিশ্বেশ্বরের অন্য এক অত্যদ্ভুত অভিনব বিশ্ব দর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন মনে হয়, যাহা কখন দেখি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করি নাই, তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিলাম। কীটাণুগণের আকৃতি বিচিত্র, গতিবিধি বিচিত্র, ব্যবহারও বিচিত্র। তাহাদের সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে, বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। সমুদায়ে কত প্রকার কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা এক্ষণে নির্ব্বাচন করিবার সম্ভাবনা নাই। শত শত প্রকার এ কাল পর্য্যন্ত

মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, কোন প্রকার কীটাণু গোলাকৃতি, কোন প্রকার বা অণ্ডাকৃতি, কোন প্রকার বা মৎস্যাকৃতি, কোন প্রকার বা জলব্যালু-সদৃশ, কোন প্রকার বা কৃমি-সদৃশ, কোন প্রকার বা কেশাকৃতি, কোন প্রকার বা দ্বিশিরাঃ, কোন প্রকার বা শৃঙ্গশালী, কোন প্রকার বা উদ্ভিদ-সদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোনও কোনও কীটাণুর আকৃতি মানবজাতির মুখমণ্ডলের অবিকল অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। নব মুখাকৃতি কীট কুত্রাপি বিদ্যমান আছে, বোধ হয়, ইহা কোন ব্যক্তির কল্পনা-পথেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই।

কীটাণুর আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এ নিমিত্ত যন্ত্র সহকার-ব্যতিরেকে প্রায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। সামান্য জলে এমন সূক্ষ্ম-কায় কীটাণু আছে যে, তাহার কোটি কোটিটা একত্র করিলেও, এক বালুকা-কণার সমান হয় না; সহস্র সহস্রটা, অতি সূক্ষ্ম সূচিকার ছিদ্র-প্রমাণ স্থানে একত্র সন্তরণ করিতে পারে। যে কীটাণু এত বড় যে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক বুরুল-প্রমাণ স্থানে দশ কোটির অধিক থাকিতে পারে না, কীটাণুর মধ্যে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় বলিতে হয়; কিন্তু তাহাদেরও আকৃতি যেরূপ সূক্ষ্ম, তাহাই বা কে অনুভব করিতে পারে? উল্লিখিতরূপ এক বুরুলকে এক ঘনবুরুল বলে; এক ঘনবুরুল-প্রমাণ স্থানে যদি ১০,০০,০০,০০০, দশ কোটি কীটাণু অবস্থিতি করিতে পারে, তবে এক ঘনক্রোশে ২৯,৮৫,৯,৮৪,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০, উনত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নয় শত চৌরাশি পরার্দ্ধ কীটাণু অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিবস এক কোটি করিয়া গণনা করিতে পারে, তথাচ তাহার সমুদায় গণনা করিতে ৮,১৮,০০,০০,০০,০০,০০,০০০, আট শঙ্খ এক মহাপদ্ম আট নিখর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। যদি এক ক্রোশ-প্রমাণ

স্থানে এইরূপ অসংখ্যপ্রায় কীটাণুর নিবাস হইল, তবে সমগ্র ভূমণ্ডলে কত কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা কে অনুভব করিতে পারে? নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সমুদায় জলাশয় এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম ও পুষ্প তাহাদিগের বাস-স্থল। যে স্থান সহসা জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, অণুবীক্ষণ-সহকারে তাহা প্রাণীপুঞ্জে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থান আপাততঃ গতি ও ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত বোধ হয়, অণুবীক্ষণ-সহকারে, সে স্থানে কোটি কোটি কীটাণু সতত সঞ্চরণ করিতেছে, দৃষ্টি করা যায়। যে স্থলে আপাততঃ সচেতন পদার্থের সম্পর্ক মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অণুবীক্ষণ সহকারে তাহা সুখ ও সন্তোষের আধার-রূপে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত দৃষ্টি-যন্ত্র-সহকারে স্থানে স্থানে যে সমস্ত মৃত কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে, বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হত-জ্ঞান হইতে হয়। কতশত গ্রাম, নগর ও শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা কীটাণু-শবে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। দেশ-বিদেশের সুপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড কেবল কীটাণু-পঞ্জরেই প্রস্তুত। কত কত উন্নত পর্ব্বত কীটাণু-পুঞ্জের পঞ্জর-রাশি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কীটাণুগণের গতিবিধি ক্রিয়াদিও সাতিশয় বিচিত্র। কতকগুলি কীটাণু নির্জীব পরমাণুবৎ চিরজীবন একস্থানেই অবস্থান করে। কতক-গুলি আবার কিছুদিন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, উত্তরকালে একস্থানে স্থাবরবৎ স্থির হইয়া থাকে। অবশিষ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্ব-দিকেই গমনাগমন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অনেকবিধ কীটাণু আলোকময় স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু বহুপ্রকার আবার ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করে। কতক-গুলি মাংসাশী; তাহারা আপন অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর অন্য জাতিকে হনন করিয়া ভোজন করে। অপর কতকগুলি নিরামিষভোজী; তাহারা

অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্-পদার্থ আহার করিয়া জীবিত থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম জীবের, পশু, পক্ষী, মৎস্যের ন্যায় পদ, পক্ষ ও পাখ্‌না নাই, অথচ অনেকে অতি সত্বর গমনাগমন করিয়া থাকে। অনেক প্রকার কীটাণু জন্মান্ধ, অথচ অন্য পশু সন্নিহিত হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারে; এবং অন্য জাতীয় জীবকে আক্রমণ ও হনন করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের জন্ম-মৃত্যুও অসামান্য নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়। বৃক্ষের শাখায় যেমন কলিকা উৎপন্ন হয়, কোন কোন কীটাণুর সন্তান সেইরূপ তাহাদের গাত্রোপরি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর কতকগুলি কীটাণুর শরীর আপনাপনি বিভক্ত হইয়া থাকে, এক এক ভাগ এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী হইয়া উঠে। কোন কোন জাতির জন্ম-মৃত্যু সুখসম্ভোগ সমুদয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নির্ব্বাহিত হয়। কোন কোন জাতিরা ২০।২৫ বিশ পঁচিশ দিবস জীবিত থাকে। কীটাণুগণ যে জলাশয়ে অবস্থিতি করে, তাহা শুষ্ক হইলে, উহাদের কলেবর ধূলি-কণাবৎ পরিশুষ্ক হইয়া পতিত থাকে। কিন্তু তিন চারি বৎসর পরেও যদি তাহাতে জলস্পর্শ হয়, তবে ঐ সমস্ত মৃতবৎ দেহ তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবন পাইয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও কুর্দ্দন করিতে আরম্ভ করে। মৃতদেহে পুনর্ব্বার জীবন-সঞ্চারের বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাসের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বিশ্বপতির বিশ্বমধ্যে সর্ব্বস্থানেই যে আবহমান কাল তদনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম, সজীব, নির্জ্জীব, স্থাবর, জঙ্গম যে কোন পদার্থে নেত্রপাত করি, তাহাতেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অপরিসীম মহিমা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এক দিকে দূরবীক্ষণ-সহকারে নভোমণ্ডল-বিক্ষিপ্ত দীপশিখা-সদৃশ প্রতীয়মান প্রত্যেক জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল এক এক প্রকাণ্ড জীবলোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ-সহকারে

এক এক বিন্দু-প্রমাণ স্থানে এক এক বিশালতর জীবলোকের ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইতেছে। এক দিকে দূরবীক্ষণ-প্রদর্শিত সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত তুলনা করিলে, পৃথিবী এক বালুকা-কণা অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ সহকারে প্রত্যেক বনের পত্রমধ্যে, প্রত্যেক উপবনের কুসুমমধ্যে ও প্রত্যেক জলাশয়ের জলমধ্যে জীব পরিপূর্ণ, সংখ্যাশূন্য, জীবলোকের ব্যাপার দিবানিশি সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইতে থাকে। আমরা দূরবীক্ষণ সহকারে নভোমণ্ডলে যতদূর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান, শক্তি মহিমা ও করুণার অসংখ্য নিদর্শন অলক্ষিত রহিয়াছে, এ বিষয়ে যেমন সংশয় হইবার বিষয় নাই, সেইরূপ এক্ষণে অত্যুত্তম অণুবীক্ষণ-সহকারেও যে স্থানে অতি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্যান্ত লক্ষিত হয় না, তাহাও মনুষ্যকৃত সর্ব্ববিধ দৃষ্টি-যন্ত্রের অলক্ষ্য অদৃষ্টিগোচর জীবপুঞ্জের অধিষ্ঠানভূমি হইবে, ইহাতে অসম্ভব কি? কি আশ্চর্য! এক এক অণুপ্রমাণ স্থানে কতই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, কতই সুখ ও সন্তোষ সঞ্চারিত হইতেছে, বিশ্বপতির কতই অবিনশ্বর কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গগন বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া, অন্তঃকরণ অবিচলিত রাখা যদি কখন সম্ভব হয়, তথাচ সমুদ্র-নিবাসী কীটাণুগণের সংখ্যা স্মরণ হইলে, চিত্তভূমি বিচলিত ও শিরোদেশ বিঘূর্ণিত না হইয়া পার পাইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহিমার্ণব! তোমার এ কীদৃশ মহিমা!

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

(বাল্যের শিক্ষাপ্রণালী)

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস্ মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটে, এবং জনষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ছুটিয়া থাকে। জেমস্ পুত্রকে অগ্রে কোনও বিষয় বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকে পাঠ্যবিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সমর্থ না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেন। এইরূপে মিল্ শৈশবেই চিন্তাবিষয়ে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী হয় না, পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্বায়ত্ত কর, ইহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর, এবং নিজে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা কর, তবেই দেখিবে তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন স্ফূর্ত্তি পাইতেছে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতেছে।

মিল্ যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন, সেই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নন; আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি দেশ ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজী বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে যান নাই। অথচ তিনি সেই বাল্যাবস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চশাখায় আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণতঃ শিক্ষা-তরুর

নিম্নশাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? মিল্ বাল্য বয়সে পিতার নিকট শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল;—

"পিতা শৈশবে আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, সে জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যে অনায়াসে আমার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণাক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতিসিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বলিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে আমি যাহা করিয়াছি তাহা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যদি আমাদ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবের গুণে।"

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষলাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণশক্তির সম্মার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই অগ্রে আমাকে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায়, আমার চিন্তাশক্তি অচিরকালমধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।"

"আত্মগরিমা বালপাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহায্যে অনেকের ভাবি-উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আত্মোৎকর্ষসূচক তুলনা বা আত্মপ্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়া বোধ হইত।"

"তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদিও ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আমাপেক্ষা ন্যূন বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না যে, আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত যে, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকবশতঃই কেবল সে রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখনও বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু উহা কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে, আমি এত বড়লোক বা এমন মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখনও উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখনও নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি, আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখনও আপনার বিষয় ভাবিয়া থাকি সে এইমাত্র যে, আমি পঠনদ্বারা কখনও পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না; সুতরাং আমি পড়াশুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না।"

"চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে দেশভ্রমণার্থ দীর্ঘকালের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে হাইড্‌পার্ক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা আমায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'তুমি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া

অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন ; সুতরাং অনেকেই তোমার এই উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে, এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। দেখিও যেন সেই সকল কথায় ও সেই সকল প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময়, তোমার যেন মনে হয়, তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণ নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ন্যায়, সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্যবলে স্বয়ং তোমার শিক্ষা বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা সেই সৌভাগ্যের ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই ; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে।' এই বাক্যগুলি অদ্যাপি যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই, আমায় সর্ব্বপ্রথমে প্রতীত করে যে, আমার সমবয়স্ক যে সকল ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে কোন প্রকার আত্মাভিমান জন্মাইয়া দিল না। যতবারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, ততবারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্যগুলি প্রতিধ্বনিত হইত।"

৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

সাধারণের উন্নতি।

কোন একটি দেশে কেবল উৰ্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, “যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবারমধ্যে কখনও লক্ষ্মী থাকেন না।” আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোকসকল অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। কেবল এই একটি বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মগণের গঠিত এই বিশাল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্যে বা দ্বিজসেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেইবার ভারতে আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্নস্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্রবৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষে ‘উন্নতি উন্নতি’ বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজারু ইটের কাঁচা গাঁথুনি আছে। এবং বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা

লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে।
তখন যেরূপে আর্য্যভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি যে, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে কিম্বা গায়ে বল থাকিলে, অথবা লেখাপড়া শিখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক, ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, লেখাপড়া শিখুক, আর ভদ্রসন্তানের অবস্থা হীন হউক এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি—সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীরবাসী ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল? না যেখানে ৫০ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, ৫০ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কারকারবারি শাঁসেজলে ৫০০ ঘর নবশাখ আছে, সেকরায় সোনা-রূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁসারিতে ঢালাই গলাই করিতেছে, জেলে বাগদী মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু'পয়সা, দু'সিকি আছে, আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচ সাত জন লেখাপড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে এবং বিল কবজ পড়িতে পারে, এরূপ স্থানে থাকা ভাল? আমাদের বিবেচনায়, অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অল্প কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করা শত গুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে, ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়, প্রমাণ বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি। যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের সমাজের পতি, তিনি এইখানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া, ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য এবং তমসাচ্ছন্ন।

সমাজের নিম্ন-স্তরে, সকলের সম্প্রসারণ-শক্তি না থাকিলে, উর্দ্ধতন শ্রেণীর কথন স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধারণকে তাঁহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচ জনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকের দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজপরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত,—শিক্ষার সার হইতেছে- পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান হইতে পারেন, বুদ্ধিমান হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি, এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলিত করান নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা সহজেই পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচ জনের জন্য ভাবিতে শিখিব; আমি যদি আরও দশ জনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশ জনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শিক্ষাদোষে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যতদিন উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্ন-স্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন, এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আজি কালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন; যাহাতে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে; সাধারণে শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা!

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সীতাপতি গোস্বামী কে ?

শিবজী সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"গোস্বামিন্‌! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা, আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না। রায়গড়ে আপনার বীর-পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ, চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কি জন্য? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন, আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে আপনার নাই।"

সীতা। "প্রভু! আপনার মিষ্ট-বাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়। ব্রত সাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়; এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।"

শিব। "এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না, কিন্তু দিবসে একদিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না, রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটাধারণ করিয়া একবার দেখা দেন, দুই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান, আর দেখিতে পাই না। সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?"

সীতা। "সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব? সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।"

শিব। "ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—"আমার ললাটে একটু

অমঙ্গল-লিখন আছে। আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া আমি জীবন দিতে আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট, সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।”

শিব। “এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কে বা আপনাকে অমঙ্গলখণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?”

সীতা। “কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটি জানিতে পারিলাম; ঈশানীমন্দিরে একজন সতী-সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবন ধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি?”

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না, বলিলেন—“সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাঁহার জন্য প্রাণ পণ করি, তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।”

সীতা। “প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?”

শিব। “জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষ বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে, এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।”

প্রায় উদ্বেগরুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাঁহার নাম কি?”

শিবজী বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার।” ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল! শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে

অতি কষ্টোচ্চারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, "দীপ অনাবশ্যক,—বলুন শ্রবণ করিতেছি।"

শিব। "আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকটে আসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার; সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনারি ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না। কিন্তু সেই উন্নত-হৃদয়ে আপনার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি. আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।"

সীতা। "তাহার পর?"

শিব। "সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম. সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি!"

সীতা। "তাহার পর?"

শিব। "এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গ জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপনার অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।"

সীতা। "তাহার পর?"

শিব। "আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি এক দিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই। যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।" শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; অনেক পরে সীতাপতি বলিলেন—"আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।"

শিব। "দোষী? রঘুনাথের উন্নত-চরিত্রে দোষ স্পর্শে নাই। আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধ-স্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধের পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল। সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি!"

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,—"সীতাপতি!"

কোনও উত্তর পাইলেন না; কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোস্বামী কে?

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

বাল্মীকির জয়।

(১)

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ় নীল, বর্ণনার অতীত, মনোমোহন নীল রঙের ছটার মাঝে বড় বড় তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজি মধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই প্রকাণ্ড চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্মেঘ, যখন ধুন্দুলার সম্পর্ক মাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এক দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত-স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল-নগরী-সমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারি দিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের

আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকার মধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেইখানেই গাছ পালা বন, আর সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড়, তাহার তলা কোথায়?—দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদন সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যা-রাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

উক্ত শরৎ অমাবস্যা রাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিত অসংখ্য ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশ-পটে বিরাজ করিতে লাগিল। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষীরা ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্রজ্যোতির্ম্ময়

ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া, আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া, দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহাআনন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে। কিন্তু সে শ্রুতিমনোহরস্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত—মহামোহনিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতান স্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রাহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। কেহই বুঝিল না কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল। কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিন জনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন। তিন জনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া হিমালয়-চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতের চূড়া ; যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের নাম লোপ হইবে না।

প্রথম, মহর্ষি বশিষ্ঠ ; দ্বিতীয়, বিশ্বামিত্র ;—তৃতীয়, বাল্মীকি।

আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাহিতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই

চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন ; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। জ্ঞান-চৈতন্য-হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে 'ভাই ভাই ভাই।' ঋভুরা যেন বাহু প্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছেন, 'এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই,এস ভাই ভাই ভাই। সবাই ভাই।' সুর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে 'ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।'

পৃথিবীশুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল 'ভাই ভাই।' ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল 'ভাই ভাই।' পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল 'ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।'

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল 'ভাই ভাই।' যেন মোহিনীতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল 'ভাই ভাই।' একজন পণ্ডিত, একজন দিগ্বিজয়ী, আর একজন দস্যু, সবারই মনের বিরোধীভাব যেন মুহূর্ত্ত জন্য তিরোহিত হইল। সবারই হৃদয় যেন একতান-মনপ্রাণে বলিয়া উঠিল—'ভাই ভাই ভাই! আমরা সবাই ভাই।'

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনই উন্মত্ত যে বেগবান্ চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তল-বাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র

ভাবনার ত কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময় তেমনই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—' আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।'

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—' আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।'

আর বাল্মীকির অন্তরে অন্তরে কি ভাবনা? বিষম আত্মগ্লানি! ' হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভায়েদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!'

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই।

বাল্মীকির জয়

(২)

ওদিকে বাল্মীকি হিমালয়-জঙ্গল-মধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দ্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যতই ভাবেন ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন্ পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুলকাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে এক দিন

এক ক্রৌঞ্চ মিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে, বাল্মীকি একতানমনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব-কথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূতলে লুটাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ব্যাধ দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

বলিবা মাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝর-মধ্য হইতে একটি কন্যা কাননপথ আলো করিয়া আসিতেছে, তাহার কান্তি অপ্সরা-বিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ-মন্দ ও হৃদয়-মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু, পক্ষিগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না! বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমল হৃদয় দেখি নাই, এইজন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি

চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বীণা তাঁহার হাতেই রহিল, সরস্বতী অন্তর্ধান হইলেন।

এ দিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগ করতঃ লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয়জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক একটি অমূল্য ধন, এক এক বিন্দুতে শত অত্যাচার দমিত হয়। এই ভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্য্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করিবেন জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। এক দিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন, আর নয়নাসারে সলিল-প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতি দূরে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইল; প্রথম ডাকাইতির মত চীৎকার, তার পর আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, বাল্মীকি আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ্ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম্ম ছাড়।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ, তুমি নিজের জন্য কাঁদ, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি একবার পরের জন্য কাঁদ দেখি সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে; তাহাতে আবার যদি তোমার কান্নায় গভীর সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে আরও কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যুদলপতি একটু গলিলেন; গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে

পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লুঠ-তরাজ বন্ধ কবিতে হুকুম দিলেন। তাঁহাব নিজের দল থামিল। কিন্তু তাঁহাব দলে যে ম্লেচ্ছ, যবন, বানর ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন বাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন। একে রাক্ষস, তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহাব কথা তাহারা কেন শুনিবে? তাহাবা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগর-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন, ম্লেচ্ছ ও বানরেব সহিত মিলিত হইয়া ভীম পরাক্রমে দস্যুশিবিব আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবির মধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন বাল্মীকি বীণা হস্তে "ভাই ভাই" গাহিতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহাবা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীম-পরাক্রমে আক্রমণ কবিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, দয়া-ভিক্ষায় পূর্ণ হইল। মানব-দুঃখ-বর্ণনায় পূর্ণ হইল। হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। বাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঋভুদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজ সমস্ত দস্যুদলেব সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর. সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে যেমন বলিতেছে "ভাইরে যা করেছিস্ করেছিস্, আর করিস্‌নে। দেখ্ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্। সকলেই মানুষ 'ত? তোর শরীর যেমন রক্ত মাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়;

কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হস্, আর অন্যের মস্তকে তরবারির আঘাত করিস্। আহা! একবার মনে কর দেখিরে তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসে কাটিস্, কিন্তু একবার মনে কর দেখিরে তোর নিজের ছেলের ওরকম হ'লে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর গুরো। উপায় বলিয়া দাও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন. পর কেহ নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর অন্য মানুষে ভেদ কি? সবাই মিল, সবাই মিল, একতান একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন দুই থাকে?" গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে? কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে? হীনকবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে?

গানের ফল এই হইল, সকলে দস্যুবেশ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহাই আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও, সুখী হইবে।"

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চরিত্র।

নিষ্কলঙ্কচরিত্র অমূল্য সম্পত্তি। কোন পার্থিব সম্পত্তির সহিত উহার তুলনা হয় না। পরিশ্রমী, সত্যবাদী, উদারচেতা ও সর্ব্বপ্রকার সাধুস্বভাবসম্পন্ন মানব সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজনসমাজে, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা সুখপ্রদ ও উৎকৃষ্ট, তিনি তাহারই অধিকারী হয়েন। তাঁহার অভাবে জগৎ জীর্ণ হইয়া অশান্তির উৎপত্তি করে, তিনি যে সমাজে অবস্থিতি করেন, সেই সমাজই স্রোতস্বতীর সলিলসিক্ত শস্যশ্যামল ভূখণ্ডের ন্যায় নিরন্তর শ্রীসম্পন্ন থাকে। মানবের সত্যবাদিতা, উদারতা ও সাধুতা চরিত্রগুণেই বর্দ্ধিত হয়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি লোকের নিকটে প্রশংসা লাভ করেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রশংসার সহিত লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ যখন সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে সযত্ন হয়েন, চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ তখন সমাজের ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট থাকেন। সমাজ এক জনের সুখ্যাতি করে, অপর জনের অনুকরণে ব্যগ্র হয়।

চরিত্রবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা বিবেকের অধীন থাকেন। তিনি অসৎ বিষয়ে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, সৎ বিষয়ের সেইরূপ আদর করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিকার্য্যেই তদীয় সাধুতার নিদর্শন লক্ষিত হয়। গ্রীসদেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস বার বার নিপীড়িত হইলেও কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধরিপু যেন আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায় নিরন্তর তাঁহার পদানত থাকিত। মিবারের অধিপতি রায়মল্লের পুত্র কোন অবৈধ কার্য্য করাতে একজন রাজপুত বীর উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে। মহাত্মা রায়মল্ল পুত্রহন্তাকে পুরস্কৃত

করিয়া রাজপুত-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। সচ্চরিত্র ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বক্ষণ সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ থাকেন। তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধাসহকৃত বিনয় ও সৌজন্য নিরন্তর পরিস্ফুট হয়। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মান ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, সেইরূপ বন্ধুজনের প্রতি প্রীতিদর্শন ও অনুজীবীদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সামান্য লোকের কোনও গুণ দেখিলে তিনি সেই গুণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন না। গুহক চণ্ডাল হইলেও রামচন্দ্র তাঁহার সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপালনে উদ্যত থাকেন। মানুষ পরিবার-বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং তাহাকে সর্ব্বপ্রথম পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতীয় ও পরজাতীয় লোক এবং অপরাপর জীবগণ সম্বন্ধেও তাহাকে কোন না কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতে হয়। চরিত্রশালী ব্যক্তি এই সকল কর্ত্তব্যের পালনে কখনও ঔদাস্য প্রদর্শন করেন না। তিনি পিতামাতা সম্বন্ধে আজ্ঞাবহ সেবকের ধর্ম্ম পালন করেন; স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সৌম্যমূর্ত্তি সদুপদেষ্টা প্রতিপালকের কার্য্য সম্পাদন করেন; আত্মীয়-স্বজন-সম্বন্ধে প্রীতিময় স্নিগ্ধভাবের পরিচয় দেন; স্বজাতীয় ও পরজাতীয় লোক এবং অপরাপর জীবের সম্বন্ধে দয়া-ধর্ম্মের নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। তিনি আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়াও স্বকর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল থাকেন। রামচন্দ্র জটাবল্কলধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর বনবাসক্লেশ সহিয়াছিলেন, তথাপি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পূর্ব্বকালে ইতালীতে পম্পিয়াই নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। একদা একটি সৈনিক-পুরুষ নগরে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিসুবিয়াস নামক

ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইল। প্রস্তরদ্রবে ও ভস্মস্তূপে সমস্ত নগর প্রোথিত হইয়া গেল। কিন্তু নগরের প্রহরী সৈনিকপুরুষ আপনার সন্নিবেশস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইল না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করা তাহার কর্ত্তব্য। অগ্ন্যুৎপাত ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য সেই স্থানে দেহ ত্যাগ করিল। তাহার কলেবর ভস্মস্তূপের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু তাহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল। তাহার শিরস্ত্রাণ, অস্ত্র ও বর্ম্ম অদ্যাপি তদীয় অলোক-সামান্য চরিত্রগুণের নিদর্শন স্বরূপে নেপলস্ নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাবে পূর্ণ হয় না। চরিত্রের উন্নতির জন্য আত্মশাসন থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর চারি দিকেই পাপ লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত আছে। চারি দিকেই প্রলোভন-সামগ্রী রহিয়াছে। পাপ এবং প্রলোভনের মধ্যে চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আত্মশাসনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যাহা পাপজনক ও অকর্ত্তব্য তাহা চিরকাল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মশাসন না থাকিলে পাপ হইতে দূরে থাকিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এরূপ স্থলে মানব প্রায়ই কুপথে পদার্পণপূর্ব্বক আপনাকে কলুষিত করে। যখন কোনও অন্যায় ইচ্ছা জন্মে, তখন আত্মশাসনবলে সেই ইচ্ছার দমন করা কর্ত্তব্য। বাল্যশিক্ষা ও সংসর্গের উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বদা অসৎসংসর্গ হইতে নিরস্ত থাকা বিধেয়।

আত্মশাসনের সহিত সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের সংযোগ থাকা উচিত। সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত, হৃদয় প্রশস্ত ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অটল হয়। সদ্দৃষ্টান্তে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান-ইচ্ছা জন্মে। চরিত্র ক্রমে সুশিক্ষা ও

সদ্দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন তাঁহাদের এই সকল বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে, তাঁহাদের শিক্ষার সার্থকতা হয় না। তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ন্যায়ানুমোদিত ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে নিরন্তর তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল ভাবের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থী সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং শিক্ষকের উপদেশ সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হইবেন। তাঁহাকে প্রত্যেক কার্য্যেই বিশুদ্ধ ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশুদ্ধ ভাবের সংরক্ষণে, বিশুদ্ধ বিষয়ের পরিচিন্তনে, বিশুদ্ধ গ্রন্থের অনুশীলনে, তাঁহার শিক্ষার যেরূপ উৎকর্ষ হইবে, চরিত্রও সেইরূপ উন্নত হইবে।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

পল্লীগ্রামে।

এখন ভাদ্রমাসে চতুর্দ্দিক জলমগ্ন—কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। দূরে, বহুদূরে, একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চ-ভূমিতে দ্বীপের মত দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব, এমনি সরল-বিশ্বাস-পরায়ণ, যে সয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাকেও ইহারা শিশুর মত বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মত নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্ব্বিরোধ চাষাভূষার দল—'থিওরী'তে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে আত্মীয়ের মত ভালবাসি, এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে!

কিন্তু লণ্ডন বা প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে। কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি! এ সমস্ত কথা পর্য্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—তবু এই নির্ব্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালবাসার যোগ্য নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম; দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তবে একথা স্বীকার করিব আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু চলিয়া যায়; কারণ স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

এখানকার এই নির্ব্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনই এ সমস্ত মতামত রাখা না রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে, যাহা কিছু বিশ্বাস করে, নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কাজ মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণ-মনে তাহার সেবা করে। সে জন্য কোন ক্ষতিকে ক্ষতি, কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্ম বলিয়া জানি, কিন্তু অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব বা জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবন ধারণ করিতে অধিক দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবার-নীতি, গ্রাম্য-নীতি এবং প্রজা-নীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্ত ভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্য্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্ব্বিত সভ্য-সমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেই জন্য লণ্ডন, প্যারিসের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কাণে আসিয়া বাজিলেও আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অন্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার নানাচিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লীটি তানপুরার সরল সুরের মত একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে 'আমি মহৎ নহি, বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ, সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও আমার যে একটি মাধুর্য্য আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোট বলিয়া তুচ্ছ, কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর, এবং এই সৌন্দর্য্য তোমাদের জীবনের আদর্শ।'

অনেকে আমার কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তবু আমার বলা উচিত এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য্য অনুভব করি, যাহা রমণীর সৌন্দর্য্যের মত। আমি নিজেই তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি, এ সৌন্দর্য্য কিসের? আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদয় হইয়াছে।

যাহার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য-লোক সকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থির-ভাবের প্রতি স্থির-দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই কারণে সেই ভাবগুলি ইহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অঙ্কিত করিয়া দিবার সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াছে।

সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ ধৈর্য্য, ইহাদের মুখে একটি নির্ভর-পরায়ণ বৎসল-ভাব স্থির-রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেই জন্য এই নদী কুমুদ-কহ্লারে পদ্ম-শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাব-সৌন্দর্য্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।

আমার এই চাষাদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির রঙ ধরিয়া গিয়াছে। সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্য আমার বড় একটি আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্রী এতই সুকুমার যে, কেহ যদি বলেন দেখিলাম না এবং কেহ যদি হাস্য করেন, তবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

বাইবেলে লেখা আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নম্রতাটুকু এখানে দেখিতেছি, ইহার একটি স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছু নাই—সে বলের দ্বারা কোনও কাজ করিতে চায় না—এক সময় পৃথিবী তাহার হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী সরলতা, আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্য-পুত্রের চিত্ত অতর্কিত-ভাবে অধিকার করিয়া লইতেছে, এককালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরাণী হইয়া বসিবে। এখনও হয় ত তাহার অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আশা আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামায়ণ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে লেশমাত্র শুষ্ক হয় নাই। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে—মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাহাদের নাম হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্ব্বরা করিয়া রাখিতেছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে, রামায়ণমহাভারত-সমালোচনা অন্য কাব্য-সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই আমাদের শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত বিচার করিবার বিষয়।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই এ কাব্য রচিত নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত—সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়া রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু-গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।"

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ করিয়াছেন?—তখন নারদ কহিলেন—

"দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥"

এত গুণযুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্ম্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ-জয়, শত্রু-

বিনাশ. দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণতঃ মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই - সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষমাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ঘরে আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এই-রূপ ব্যক্তিবিশেষের, প্রধানতঃ, ঘরের সম্পর্কগুলি কোন দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত।

গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্ম্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কু-চক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজ-গৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্ম্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সহস্র বৎসর ধরিয়া রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা

আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মনুষ্য, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হইত না, যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর-কল্প লোকের সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসারের মধ্যে ধরা না দিত। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে। ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য।

পাটলিপুত্ররাজ অশোক ও কাশ্মীর-রাজ কণিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা চারি দিকে যাইয়া অহিংসা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ছয় শত বৎসর পরে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-পুস্তক সকল লিপিবদ্ধ হয়। এই সময় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারকেরা যবদ্বীপে যাইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট অবনত-মস্তক হইতেছিল, তখন কতিপয় প্রচারক মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে যাইয়া আপনাদের ধর্ম্ম বদ্ধমূল করেন। কণিষ্কের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবনী-শক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৩২ অব্দে কোরিয়া-বাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয়-দিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে এত সম্প্রসারিত হয় নাই, কোনও ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর এত অধিক লোক আদর ও সম্মান দেখায় নাই। পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৪০ জন বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

"ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যসিংহই সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন।

শাক্যসিংহের পূর্ব্বে আর কেহই সমস্ত বৈষম্যের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয় নাই। সকলের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শিত হওয়াতে সকলের মধ্যে সমবেদনার সঞ্চার হয়। বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একতাস্থাপন ও এইরূপ সমবেদনার উৎপাদন, বৌদ্ধধর্ম্মের একটি ফল। অধিকন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়; দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; অশোক এই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-কর্ত্তা। অশোক অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া অনেককে একভূমিতে আনয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি হয়। এত দিন দক্ষিণাপথ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করাতে ক্রমে উহা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় খণ্ড রাজ্য থাকা ভাল, কিন্তু সভ্যতা বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ রাজ্যে অনেক উপকার হয়। অশোকের সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধিতে উপকার হইয়াছিল, যেহেতু বাক্ত্রিয়ার, গ্রীক অথবা অন্য কোন বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিতে সাহসী হয় নাই।

যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহারা আপনাদের ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। ক্রমে অনার্য্যেরা আর্য্যদের সহিত সম্মিলিত ও আর্য্যদের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিবার জন্য আর্য্যদের ভাষা অনেক অংশে আয়ত্ত করে। এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্য-ভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে যখন অনার্য্যদের উন্নতি হয়, যখন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাদের ভাষাও উন্নত হইয়া

উঠে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিপুষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত যাগযজ্ঞে পশুহত্যা ও সোম প্রভৃতি সুরার ব্যবহারও অল্প হইয়া আইসে।

এদিকে ব্রাহ্মণেরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা নানা উপায়ে আপনাদের ধর্ম্ম সঞ্জীবিত করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিতে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। শ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও স্থানে স্থানে সম্পূজিত ও সম্মানিত হইতেছিলেন। অহিংসার পার্শ্বে হিংসার, সাম্যের পার্শ্বে বৈষম্যেরও প্রভাব দেখা যাইতেছিল। খ্রীঃ ২৪৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীঃ ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল উভয় ধর্ম্মের এইরূপ প্রাধান্য ছিল। পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইয়া আইসে. মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি-স্রোত যখন সঙ্কীর্ণ হয়, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এতদিন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণের বিদ্যা, বুদ্ধির মহিমায় ও ক্ষত্রিয়ের অর্থের ক্ষমতায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উন্নত হইতে থাকে। বৌদ্ধের চৈত্য, বৌদ্ধের মঠ, ভারতবর্ষ প্রায় ছাইয়া ফেলিয়াছিল; ইহা ব্যতীত বৌদ্ধের অট্টালিকা স্থানে স্থানে শোভাবিকাশপূর্ব্বক সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল। লোকে বৌদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে হিন্দুমন্দিরের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে রামসীতা, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তির পূজায়

হিন্দুদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল। এদিকে হিন্দুরা কোমল ভাষায়, কোমলকণ্ঠে আপনাদের ধর্ম্ম-বীর ও যুদ্ধবীরগণের চরিত্র নানা স্থানে গাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোকে এই মধুর কথা শুনিয়া সন্তুপ্ত হইতে লাগিল। হিন্দুযোগীরা স্বার্থত্যাগে ও কঠোর ব্রতাচরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিলেন। এই সকল যোগী প্রখর রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, অনাবৃতস্থানে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া একান্তমনে যোগাভ্যাস করিতেন। গ্রীকেরা ইহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ধর্ম্মের জন্য ইঁহাদের এইরূপ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, দলে দলে হিন্দুদের পদানত হইতে লাগিল। হিন্দুদের আর একটি সুবিধা ছিল। হিন্দু-সমাজে থাকিয়া সকলেই আপনাদের রুচি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত। কেহ দেবতার পূজা করিত, কেহ একেশ্বরের উপাসনা করিত। কেহ ব্রাহ্মণের ও স্বশ্রেণীর অন্ন ভিন্ন আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিত না, কেহ বা ইচ্ছানুসারে সকলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এ সুবিধা বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল না। তাহার উপর বৌদ্ধেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহারা সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা যথোচিত সাহস সংগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই বিমুখ হইলেন না। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাদের ক্ষমতা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, সহস্র সহস্র লোকে অবনত মস্তকে তাঁহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। খ্রীঃ ১,০০০ অব্দে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত হইল। হিন্দুর আরাম-ভূমিতে হিন্দুধর্ম্ম আবার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হিন্দুগণ সকল বিষয়েই

আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং ধর্ম্ম-বিপ্লবে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠেন, ক্রমে তাঁহারা অভিনব বিষয়ে উদ্ভাবনা দেখাইয়া, সাধরণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকেন। উপনিষদে যে সকল গভীর তত্ত্বের বিবরণ আছে, বোধ হয়, তাহাই সমস্ত জগতের আদিম দর্শনশাস্ত্র। ঐগুলি সে সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল।

মহাভারতের সময়ে দর্শনশাস্ত্রের আবার জীবনীশক্তি লক্ষিত হইলেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। মহামতি শাক্যসিংহ যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন, সকল স্থানে যখন সাম্য ও অহিংসার আদর লক্ষিত হইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় বুদ্ধকে অধঃকৃত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

হিন্দুদের এইরূপ মানসিক উন্নতিতে দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে উন্নতাবস্থ ষড়্-দর্শনের প্রচার হয়। স্মৃতি, আর্য্যদের আচার-ব্যবহার-বিষয়ক গ্রন্থ। এই সময়ে ইহা সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়। এইরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব-সময়ে প্রায় সকল দিকেই হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভারতের গৌরবের একটি প্রধান সময় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও সাধারণের উন্নতি ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন দেখা যাইতে থাকে। জ্ঞান ভাণ্ডারের এক দিকে প্রতিভা ও গবেষণার আলোক বিকাশ পাইলে ক্রমে অন্যান্য দিক্ উহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; এবং লোক-সমাজের এক দিকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও কার্য্য-কারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই স্রোত সমস্ত সমাজে ব্যাপিয়া পড়ে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তাহাতে ভারতের লোক-সমাজ এক

হাজার বৎসরেরও অধিক কাল সজীব ও সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে সমাজের সকল বিভাগেই অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার দেখা যাইতেছিল, সকল বিভাগই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তেজের মহিমায় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুরা বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন, আরব ও মিশরের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপনাদিগকে বরণীয় করিয়া তুলেন। ইঁহাদের দূতগণ রোমের সম্রাটের নিকট আদরসহকারে পরিগৃহীত হন, ইঁহাদের কার্পাসবস্ত্র, মস্‌লিন, রেশমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি আরব ও মিশরের বণিক্‌গণ গ্রহণ করিয়া আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ করিতে থাকেন, এবং ইঁহাদের শাসনপ্রণালীর শৃঙ্খলা ও নগরের পারিপাট্য দেখিয়া বিদেশী ভ্রমণকারীরা ইঁহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। এদিকে আর্য্যেরা সারস্বতী-শক্তির উপাসনাতেও বিশেষ যত্নশীল হন। তাঁহারা জ্ঞানের মহিমায়, দূরদর্শিতার গরিমায়-ক্রমে জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় শকের প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়গণ শাস্ত্রালোচনায় আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদির শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে জ্যামিতি ও গণিত বিদ্যারও যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছিল এবং স্বর-সংযোগে বেদগান-সময়ে মন্ত্রের উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গে ব্যাকরণেরও কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই প্রকৃষ্ট-পদ্ধতি-ক্রমে জ্যোতিষ ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহ-মিহির এই সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আর্য্যভট্ট এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ-বিধানে যত্নশীল হন। ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় দুহিতা লীলাবতী

গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চরক ও সুশ্রুতের যত্নে চিকিৎসাবিদ্যার ভূয়সী উন্নতি হয়। কালিদাস অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সকলের বরণীয় হন। অমরসিংহ অভিধান সঙ্কলন পূর্ব্বক সাহিত্য আলোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। এইরূপে ভারতবর্ষের এই গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েই ক্রমোৎকর্ষ হইতে থাকে। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত হইয়াছিল।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে জল বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত-দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে ধাতুপুঞ্জও ঘন-নিবিষ্ট এই জন্য; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গ-সন্ধিকে শিথিল করিতেছে; তাহার দৈহিক ধাতু-সকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে; বহুল শিলাখণ্ড অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে; চক্ষের নিমেষে তরু-লতা শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে; আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে; শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া, সুদূর-প্রসারী অরণ্যানী-সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন! কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে, শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে, গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই? তেমনই,

কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন গিরি এমন আছে যে নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনই কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া সাধারণের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান; তিনি আভ্যন্তরীণ মাল মশালার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাচার উপরে উঠে, তেমনই কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া, সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়;" মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব-লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "শতানামেমি প্রথমঃ," আমি শতজনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই। রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এ দেশবাসীদিগের ভিতরে লক্ষের মধ্যে—লক্ষের কেন কোটির মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বা বলি কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্ত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমামধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত দিবালোকের নিকটে

আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছ-লগ্ন জ্যোতিঃ-কণিকা-মাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন স্বয় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই যে তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উন্নত-শিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কোন গুণে? তাহাও পুর্ব্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের সাহায্যে।

প্রথম উপাদান, তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানব-আত্মার-মহত্ত্ব-জ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানব আত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত; তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার এবং দাসত্বকে তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন যে, তদ্দ্বারা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত করে।

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর এক দিকে, অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনই একটা প্রভাব ছিল, এমনই একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্হিত ছিল বলিয়া, তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্ম-শক্তিতে এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে

পারিত না; কোনও বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্য-সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাঁহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন; এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইংরাজি বুল্‌ডগ্‌ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কাম্‌ড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্‌-ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল; তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত, ততই তাঁহার বীর-হৃদয় আনন্দিত হইত। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয়, যে উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহার নির্ভীক হৃদয় বিঘ্ন-বাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত, যে উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজের শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্নবাধা পাপপ্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এই জন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার

কথা, নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা, যে এই ভৌতিক জগত যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ তেমনই মানবের জীবন ও মানব-সমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্ম নিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানবজীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছার দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়' তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানবজীবন তাঁহারই দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই শাসনাধীন; সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্ম-বীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল; সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহে বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা, সমুদয় সেই মঙ্গল-পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই;

কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে, বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেন্টপল একস্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me." অর্থাৎ যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে। কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছেন তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব জ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতাজ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, 'যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি, আমার প্রতি যে কার্য্যভার পড়িয়াছে তাহা আমি সাধন করিয়া যাই।' তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে তুমি আমিও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্ব-জ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না; যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

তৎপরে যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল।

এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতেই, তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের সুখ দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্কর নরসেবাব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল, সেটি 'The service of man is the service of God' অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এইটি সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনা যাইত। তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোন জাতির কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী।

১

শ্মশানে।

এইখানে আসিলে সকলেই সমান। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্যই এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসোই বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটক-লেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার, আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তা-শক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণ-বংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য-রজ্জুতে জুলিয়াস্ সিজার বাঁধা পড়িয়াছিল, তাঁহা এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয়

দিনের জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, এক জন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল-কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে? আমি কতটুকু?—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না! তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, হয় ত কখন দেখিবও না। কিন্তু শ্মশান-ভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও বড়; এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতা, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে, সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধ সাগরবৎ, মদমত্তমাতঙ্গবৎ দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র—কত সামান্য! এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্য এত আরাম, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা! সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়?

কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানব-জাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়া মনুষ্য-জাতি স্বীকার করি; কিন্তু জাতি, মাত্রেই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব! একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্য-জাতি মহৎ। মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তি মাত্রের ন্যায় জাতি মাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীনজাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্য-জাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেন না, আমিও মনুষ্য—মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিসের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোক তাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিভে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া সব লুপ্ত হয়। তাই বলি, এ স্থান সুখেরও বটে, আবার দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায় তাহার সুখ; যে পড়িয়া থাকে তাহার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে,

তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে; রোগজননপ্রবণতাও আছে; জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছুই দেখিতে পাইবে না; সকলই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভাল-মন্দতে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন,—সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোত, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত-মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না,—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে; সেক্‌সপীয়র গিয়াছেন, হ্যাম্‌লেট্ আছে; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতা-ধ্বজা আজও উড়িতেছে; রুসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে—অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্‌সপীয়রের দোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার

করিয়া গিয়াছেন—তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি—

" ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর-উপকার সে লাভ। "

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পৃথিবীর বয়স।

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া, মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না, জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল-নির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতাপ্রদর্শন বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ব কেশের প্রাচুর্য্য ও লোল চর্ম্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাটরেখামাত্র দেখিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালের রাশিনক্ষত্রের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই পদ্ধতিরই কোনরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয় হাজার বৎসর-মাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি;

কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচার-প্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতাবিচারে আমাদিগের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজ নামক বিচার-প্রণালী-অবলম্বনে যাহা ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপরে ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেন, মাতাঠাকুরাণীর বয়সের গাছপাথর নাই; আর এক দল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে ত কালিকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই ত সে দিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের বিন্যাস কিরূপ আছে, তাহা ঠিক্ জানি না; তবে ভিতরটা বড় গরম এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গিরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য পুত্রকন্যার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, উপরের চর্ম্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ড-গুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়;—কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু, হায়, সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে

আমাদের কত ভাইভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে ফেলিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এককালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকারপ্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত প্রভেদ! তাহারাও আমাদের মত জীবধর্ম্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির বিন্যাসে একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতীর জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিত ভাবে অথচ অবিরামে পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগালপরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরদেশে নীলমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিতভাবে

এই স্তরবিন্যাসব্যাপার চলিয়াছে, অতি প্রাচীনকালেও যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাসব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সে প্রণালীক্রমে স্তরের উপরে স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষফুট স্থূল আবরণখানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কত কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে সেই আরণ্য-উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য নদনদী মৃত্তিকা আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইলে উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ-আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃতস্তর। এইরূপে কত কাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ-স্তরের উপর মৃণ্ময়-স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ-স্তর জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথরকয়লার স্তর দেখা যায়, এবং স্থানে স্থানে এইরূপ দুই শত আড়াই শত স্তর উপর্য্যুপরি, থাকে থাকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর, পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথরকয়লার এক ফুট স্তর জন্মে; মনে কর, এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা

হইলে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচ শ' বৎসর লাগিবে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াই শ'টা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাটি লাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে।

মনে রাখিও, পাথুরিকয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর বয়সের এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত!

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিঃসঙ্কোচে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তরনির্ম্মাণে দশবিশকোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন! জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট-জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন বিচারসঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরের মধ্যে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তিব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে!

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল যে, বিগত কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণব্যাপার আজিকার মতই ধীরভাবে চলিতেছে; এবং বিগত কোটি কোটি বৎসরমধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে! অর্থাৎ কি না প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূলকিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে জগদ্বিখ্যাত সার উইলিয়ম টমসন্ (লর্ড কেল্‌বিন্) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে,—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে, নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখনও যে সেই ভাবে স্তরনির্ম্মাণ করিত, তাহা বলা অনুচিত। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্যপ্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন জীবনিবাস সম্ভবপর হয় নাই। হয় ত সূর্য্য হইতে সম্যক্ পরিমাণে তাপও তখন আসিত না। হয় ত পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ তখন এত প্রবল ছিল যে, একালের দিবারাত্রি ঋতুপরিবর্ত্তনাদির সহিত, সে কালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একখানি সূক্ষ্ম পর্দ্দা গাঁথিতে দশ বিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে বহু লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবি অগ্রাহ্য।

সম্প্রতি লর্ড কেল্‌বিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আরও ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেল্‌বিন্ যেখানে দশ কোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলে, হয় ত সেস্থলে

পঞ্চাশ কোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আবার "রেডিয়ম" নামক ধাতুর আবিষ্কারের ফলে লর্ড কেল্‌বিনের হিসাব উলটপালট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এরূপক্ষেত্রে ভূতত্ত্ববিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের পরাজয় স্বীকার করিয়া, হাল ছাড়িয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা, প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বস্তুতই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবলপর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের

না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ছিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ, আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদসত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয়-প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য-ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্র কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহার কালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেক ভয়ে একটা আস্ত আরশুলা উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায়

সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজী একেবারে না শিখিতেন বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনই বাঙ্গালীটি ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণে তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই, এমন কি, তাহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি; অথবা তাহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায় দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক এই চটিজুতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার বিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে

এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য-ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতি-শাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই, বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লইবার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃত পক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে, ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবা-মাত্র তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন এবং আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ ক্ষতি-লাভ-গণনার বা কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখনও এই রূপ

অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাব নিকাশ জমা খরচ বিচারের পর কর্ত্তব্যনির্ণয় একরূপ ব্যাপার, আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার।

মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানব-মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ-যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই, যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কামধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্য চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণমনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা

অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলে রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত-গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতে-ছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেই বিদ্যা-সাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা-বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্যদেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদন-প্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরে অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁসিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে ক্রমসানুমানের মধ্যে ক্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি ক্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে,

রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের অবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সীতা।

মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোকের পর সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ ছায়া যেমন তৃপ্তিদায়িনী, মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের পর চতুর্থ সর্গও তেমনই প্রীতিকর। যাঁহার অনুপম চরিত্র, এই সুদীর্ঘ কাল, হিন্দুনরনারীদিগের প্রাণ অমৃতাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে, চতুর্থ সর্গে আমরা সেই দেবীর, অথবা সেই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার, প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। লঙ্কাযুদ্ধের সময় সীতাদেবী কারাগারে বন্দিনী; কিন্তু সেই বন্দীশালার অভ্যন্তরেও মধুসূদন তাঁহার শোকমলিন মুখশ্রীতে যে মধুরতা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। আমরা চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই, লঙ্কাপুরী আনন্দোৎসবে মগ্ন। রত্নহারা রাজমহিষীর ন্যায় রাক্ষসরাজের কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী পুরী দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছে; গৃহাগ্রে গৃহাগ্রে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে; বাতায়নে বাতায়নে দীপাবলী সজ্জিত রহিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকে কুসুমদাম বর্ষিত হইতেছে। যাঁহার পরাক্রমে দেবগণও ভীত, সেই ইন্দ্রবিজয়ী বীর মেঘনাদ পুনর্ব্বার সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসিগণ যে আনন্দসলিলে মগ্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত উৎসব-মগ্না লঙ্কাপুরীর অতি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই আনন্দময়ী

পুরীর মধ্যে কেবল একটিমাত্র উপবনে উৎসব ছিল না। শোকের ঘনান্ধকার, রজনীর তিমিরকে দ্বিগুণিত করিয়া, যেন তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, পক্ষীর কণ্ঠে পর্য্যন্ত স্বর ছিল না। ঘননিবিড় পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া, চন্দ্রকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু অন্ধকারময় অরণ্যের অভ্যন্তরে যেমন একটিমাত্র কুসুম বিকশিত হইয়া বনভূমিকে সুশোভিত করে, তেমনই সেই আলোকশূন্য উপবনের মধ্যে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবীপ্রতিমা. চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তথায় বিরাজিত ছিল। রাশি রাশি কুসুম তাঁহার চতুর্দ্দিকে বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল; সমীরণ, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক একবার উচ্ছ্বসিত হইতেছিল; এবং দূরস্থিতা প্রবাহিনী, তাঁহার দুঃখ, কাহিনী বীচিরবে গান করিয়া, সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছিল। দেবীর মুখ বিমলিন; অশ্রুধারা, নীরবে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার কপোলদ্বয় অভিষিক্ত করিতেছিল; কিন্তু কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, সেই মলিন মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, কাননভূমি সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার নয়।

এই বনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কে, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক করে? দুরন্ত চেড়ীগণ, অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, মেঘনাদের অভিষেক-উৎসব দর্শনের জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছিল। কিন্তু সীতাদেবী একাকিনী ছিলেন না। শত্রুপূর্ণা লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও একজন তাঁহার সমদুঃখভাগিনী ছিলেন। বিভীষণ-পত্নী সরমা, তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে অশোকবনে আগমন করিতেন; তাঁহার ললাটে সধবা-লক্ষণ সিন্দূর-বিন্দু প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার মুখে তাঁহার অতীত-কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথন আর্ষ রামায়ণেও উল্লিখিত

আছে; কিন্তু ছায়া ও দেহে যেরূপ সম্বন্ধ, মেঘনাদবধের সহিত তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক। যে বৃত্তান্তের "ছায়া" অবলম্বন করিয়া, ভবভূতি তাঁহার অমর গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ রচনা করিয়াছেন, মেঘনাদবধের সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথন তাহারই প্রসঙ্গে আরব্ধ হইয়াছে। উত্তররামচরিতভিন্ন রামচন্দ্রের দণ্ডকাবাসের সেরূপ মনোহর, গার্হস্থ্যচিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সরমার অনুরোধে সীতাদেবী তাঁহাকে আপনার পূর্ব্ব-জীবনের সুখ দুঃখের কথা শুনাইতেন। সে কথা বলিতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত; পূর্ব্বস্মৃতি, মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায়, তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ করিত; কিন্তু বর্ষাজলপূর্ণ নদী, যেমন উভয় কূল প্লাবিত করিয়া, শান্তি লাভ করে, সম-দুঃখভাগিনীর নিকট অতীত কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তিনিও তেমনই শান্তিলাভ করিতেন। হায়! বন্য কপোত-কপতী যেমন, বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া, সুখে বাস করে, সীতাদেবীও তেমনই রামচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চবটীতে সুখে বাস করিতেন। রাজদুহিতা ও রাজবধূ হইলেও দণ্ডকারণ্য যেন তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সুখের হইয়াছিল। তিনি অরণ্য-ভূমিকে রাজ্য এবং অরণ্যচারীদিগকে প্রজারূপে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কাননের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর ন্যায় তাঁহার দিন সুখে অতিবাহিত হইত। দণ্ডকারণ্য যাঁহার ভাণ্ডার, তাঁহার অভাব কি? বন-রত্ন-কুসুমরাজি, অপূর্ব্ব শোভায়, তাঁহার কুটীরের চতুর্দ্দিকে নিত্য নিত্য বিকশিত হইত; বনবৈতালিক পিকবর মধুর প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিত, এবং বননর্ত্তক ময়ূরময়ূরীগণ প্রতিদিন তাঁহার দ্বারে আনন্দে নৃত্য করিত, সীতাদেবী স্বহস্তে কত বিহগশিশুকে আহার দান করিতেন, কত কুরঙ্গশাবককে প্রতিপালন করিতেন, রাজ-

গৃহের বিলাসে অভ্যস্তা রাজবধূ, সরলা বনবালাগণের ন্যায়, অকৃত্রিম বন্যভূষণে ভূষিতা হইয়া, কতই আনন্দ লাভ করিতেন। সরসী তাঁহার মনোহর দর্পণ এবং কুবলয় তাঁহার অমূল্য শিরোভূষণ হইয়াছিল। তিনি যখন বনকুসুমে সজ্জিতা হইতেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া, বনদেবী বলিয়া ডাকিতেন। হায়! সে সকল কি বিস্মৃত হইবার কথা! তিনি কখন ছায়াকে সখীভাবে সম্বোধন, কখন কুরঙ্গিনীগণের সঙ্গে ক্রীড়া এবং কখন বা কোকিলের গীতের প্রতিধ্বনি করিতেন। তাঁহার স্নেহ-পালিত বৃক্ষলতা মঞ্জরিত হইলে তাঁহার আনন্দোৎসব হইত। আরণ্য-চারিণী হইয়াও, তরুলতার বিবাহ দিয়া, তিনি গার্হস্থ্যসুখ অনুভব করিতেন। তাঁহার লতাবধূর কলিকাকে তিনি নাতিনী এবং ভ্রমরকে নাতিনীজামাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুসুমিত বনভূমিতে, জ্যোৎস্নাধৌত নদীতটে, এবং সহকারচ্ছায়া-শীতল পর্ব্বতশিখরে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে তাঁহার কতই আনন্দ! কৈলাসপুরীতে মহাদেবের পার্শ্বে অসীনা ভগবতীর ন্যায় রামচন্দ্রের মুখে তিনিও কত মধুর কথা শ্রবণ করিতেন। যে অমৃতময়ী বাণী, শক্রপুরীস্থ অশোকবনের অভ্যন্তরেও যেন তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত; নিষ্ঠুর বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে সে সঙ্গীত চিরদিনের জন্য কি সাঙ্গ করিলেন?

হায়! বিধাতা সুখভোগের জন্য সীতাদেবীকে সৃজন করেন নাই। বনবাসিনী হইয়াও তিনি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, অচিরাৎ তাহার অবসান হইল। তাঁহার সুখচন্দ্রমার রাহুরূপিণী শূর্পণখার দণ্ডকারণ্যে আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। তিনি রাজদুহিতা ও রাজবধূ; তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়াও যে বিধাতার তৃপ্তি হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন না। কুক্ষণে তিনি রামচন্দ্রের নিকট মায়ামৃগ প্রার্থনা করিলেন; কুক্ষণে তিনি, মারীচের কপট আর্ত্তনাদ

শ্রবণ করিয়া, দেবর লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিলেন; ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে হরণ করিলেন। কত দিন কত কাননচারী জীবকে সীতাদেবী বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! তাঁহার বিপদের দিনে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলেন না। হাহাকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনি কাননের জীব জন্তু, তরু, লতা এবং স্বর্গের দেবগণ, সকলেরই নিকট আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল, বীর জটায়ুঃ, তাঁহার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দান করিয়া, বীরজন্ম সার্থক করিলেন। রাক্ষসরাজের বিমান তাঁহাকে বহন করিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল; দেখিতে দেখিতে নীলোর্ম্মিময় মহাসমুদ্র তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে লঙ্কাপুরীতে কারাগারে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। হায়! রাজবধূ, রাজনন্দিনী হইয়া কে কবে তাঁহার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন? বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিবে না?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ।

'সভ্য' শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন। তবে, বোধ হয়, যাহারা সামাজিক-গুণে যত উন্নত, তাহাদিগকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষ দেহে ও মনে যতই উন্নতি করিয়া থাকুক, সমাজবদ্ধ না হইলে তাহার কিছুই হইত না। সমাজ-ধর্ম্ম মানুষকে উত্তরোত্তর সভ্যপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং বিবিধ সদ্গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি হইয়া পড়ে; তখন তাহার সকল উন্নতিই ফুরাইয়া যায়। যাহা হউক, এই শব্দের মোটামুটি অর্থ আমরা সকলেই বুঝি বলিয়াই বিশ্বাস করি। সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, ইহা কয়েকটি আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং উহাদিগের সহিত ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথম আবিষ্কার বোধ হয় ভাষা। ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে মানব কোন উন্নতিই করিতে পারিত না, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় উহা লিখিত হয় নাই, কথিত-ভাষা-রূপেই ব্যবহৃত হইত। মস্তিষ্ক পদার্থ মানবের বিশেষত্ব। এই উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়াতেই মানব ভাষার আবিষ্কার ও উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মস্তিষ্কের উন্নতি ভাষার আবিষ্কারের ও ভাষার উন্নতির হেতু। আবার, ভাষার উন্নতি ও আলোচনার ফলে মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়া থাকে। উহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতিবিধান করিয়াছে। এতদ্দ্বারা

মানব-সভ্যতা একপুরুষে যেরূপ উন্নত হয়, পর পর বংশে সেই উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সেইরূপ সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার অগ্নি। এই পদার্থের আবিষ্কার দ্বারা মানবীয় সভ্যতা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এতদ্দারা শীতনিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সামান্য কথা। কিন্তু অগ্নি রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া ও বস্ত্রনির্ম্মাণে সাহায্যতা করিয়াই প্রধানতঃ সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা সঙ্গত বোধ করি যে, অগ্নি প্রথমতঃ রন্ধনকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত; তাহার বহু পরে বস্ত্রনির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় আবিষ্কার, পাথরের অস্ত্র-নির্ম্মাণ। বোধ হয় অস্ত্র-নির্ম্মাণে পাথরই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের কোনও কোনও পর্ব্বতগুহামধ্যে পাথরের অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ছুরি, ভোজালি, বল্লম ইত্যাদি বহু অস্ত্র সে যুগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাথর দ্বারা এই সকল সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করা সভ্য মানবের অসাধ্য, অথবা দুঃসাধ্য। অসভ্যগণের চক্ষু ও হস্ত সভ্য মানবের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। অস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারিলে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মানব জীব-জগতে আপন প্রভুত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইত না। অস্ত্রের উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও ব্যবহারে পারদর্শী হইতে হইলে, ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির যে উৎকর্ষ হয়, ঐ সকল সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য বীরত্বের সহিত যেরূপ একতা, ধীরতা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও কৌশল আবশ্যক হয়, তাহার নিকট মানবীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে ঋণী।

চতুর্থ আবিষ্কার, লৌহ। ইহার প্রসাদে প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত নৌকা প্রস্তুত করিয়া মানব-পরিবার দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইাছে; হলাদি প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে; নানাবিধ

কল-কারখানা গঠিত করিয়া সভ্যতা-বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার বলে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছে ও হইতেছে।

পঞ্চম আবিষ্কার, কৃষি ও পরিচ্ছদ। যদিও চর্ম্ম এবং লতা পত্র এই অবস্থার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পরিচ্ছদ-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু তাহা অলঙ্কারের জন্য, শোভার নিমিত্ত। লজ্জা-নিবারণের জন্য পরিচ্ছদ প্রথমে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষির আবিষ্কার মানবীয় সভ্যতার একটি প্রধান হেতু। সম্ভবতঃ, ইহা হইতে আর্য্যগণ স্বীয় গৌরবান্বিত নামের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কৌশল জ্ঞাত হইবার সময় হইতেই মানব একস্থানে স্থিরভাবে বসবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বেদিয়াদিগের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শিকার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। কৃষির প্রয়োজন বশতঃই একস্থানে বাস করিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই যথার্থ সমাজের উৎপত্তি। সমাজধর্ম্ম, যাহা মানবকে মানব-নামের প্রকৃত অধিকারী করিয়াছে, তাহাও ইহারই অন্যতর ফল। কৃষিজাত শস্যে উদর পুর্ণ হওয়াতে মানবের বহু অবসর লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিয়ত ভ্রমণ ও শিকার করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত না। কৃষি হইতেই মানবের অবসর-কাল প্রাপ্তি; সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা-লাভ। এই সময় হইতেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নত হইতে লাগিল। দেহের অভাব ছাড়িয়া মনের অভাব অনুভব করিল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সময় পাইল, এবং বিশ্বের সৌন্দর্য্যে ও শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরচয়িতার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই মানবত্ব ছাড়িয়া এখন হইতে দেবত্বে উন্নীত হইবার পথ আবিষ্কার

করিবার প্রয়াসী হইল। কৃষির আবিষ্কারকে সভ্যতার এক প্রধান কারণ বিবেচনা করা যায়।

যষ্ঠ আবিষ্কার, লেখা। মানব লিখিতে শিক্ষা করিয়া সময়কে জয় করিয়াছে। এক সময়ে যে সকল উন্নতি হইতেছে, তাহা তৎকালেও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইতেছে; এবং পরবর্ত্তী কালে ও বহু সহস্র বৎসর অন্তেও মানব-সমাজের প্রভূত উপকার হইতেছে। লেখা প্রথমেই বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। নানাবিধ দুর্ব্বোধ চিত্র, বক্র, অতি বক্র, রেখা ইত্যাদির মধ্য দিয়া অক্ষর সকল বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই যে শেষ আকৃতি, তাহাও বলা যায় না। প্রথম হইতে প্রস্তর, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থের উপর লেখা হইয়া আসিয়াছে; এক্ষণে কাগজ ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত ভাষার আবিষ্কারের পরে সভ্যতার উন্নতিসাধন করিবার এত বড় প্রবল সহায় আর কিছুই হয় নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পরের আবিষ্কার, বারুদ, সভ্যতার সহায়ক, এ কথা শুনিলে অনেকে কানে হাত দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মারাত্মক যমদূতের অস্ত্রগুলিও সভ্যতার উন্নতি সাধন করিয়াছে। সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন একদিকে হত্যাকার্য্য করিয়া পশুত্বের পরিচয় দেয় তেমনই, অন্যদিকে হতাবশিষ্টদিগের আহারসংগ্রহের ও বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়া, মানবের অশেষ উপকার করে। পালন ও সংহার, পৃথক্ পদার্থ নহে, একের নিমিত্তই অন্য আবশ্যক। সুতরাং সপ্তম আবিষ্কার বারুদকেও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বারুদ আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহে হত্যাকার্য্যের বাহুল্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতস্ততঃ করিতেছে। যখন মৃত্যুর আশঙ্কা অল্প, তখনই যুদ্ধও সহজেই বাধিয়া

উঠে ; এই আশঙ্কা অধিক থাকিলে, যুদ্ধ কম বাধিত। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্রাদি মোটের উপর মানব-সমাজকে উন্নতই করিয়াছে। উহারা বিভিন্ন জাতীয় মানবকে পরস্পরের সহিত সংস্পৃষ্ট করিয়াছে, ভাব-বিনিময়ের সুবিধা ও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব্বকালে যুদ্ধবিগ্রহ বর্ত্তমানকালের ন্যায় এত অধিক মারাত্মক ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু এ স্থলে এ কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, যেরূপ সংস্রবের, ভাব-বিনিময়ের ও সভ্যতা-বিস্তারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অনেক জাতি, বিশেষতঃ বিজিত জাতি, কখনও কখনও জগৎ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোনও জাতি উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা এখনও যাইতেছে সত্য, কিন্তু মানব জাতির সভ্যতা যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। জাতি মরে, কিন্তু তাহার সভ্যতা মরে না ; কোনও না কোনও ভাবে উহা সজীব থাকিয়া মানব জাতির কল্যাণ সাধন করে। জগতে মোটের উপর কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। বারুদ আবিষ্কার এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ইহার পরেই বিদ্যুৎ আবিষ্কারের কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী-উদ্ভাবনের কথা এ স্থলে সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাকে মানবীয়-সভ্যতার বাহ্য-বিকাশের সহিত গুরুতররূপে সংস্পৃষ্ট মনে করি না। এ নিমিত্ত আমি অষ্টম ও শেষ আবিষ্কারের স্থলে ব্যোমযানের উল্লেখ করিব। এই আবিষ্কারের যুগ চলিতেছে। কালে এই হেতু মানব-সভ্যতা কি আকার ধারণ করিবে, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। মানব বাষ্পীয়-শকট ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জলে স্থলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন সে আকাশ বিজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফল মানব-সভ্যতাকে গুরুতর ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিক্ হইতে সভ্যতার বিকাশের আলোচনা করিতেছি, দেখিলাম, উহা কতিপয় আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। উহাতে এক দিকে যেমন নির্দ্দিষ্ট সমাজের বন্ধন দৃঢ় করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বাহ্য প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সভ্যতার এই দিক্‌টা বাহ্য-বিষয়ক, ইহা পরমার্থিক নহে। মানব মানসিক উন্নতিতে অগ্রসর হইতে না পারিলে তাহার সভ্যতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মনের উন্নতিই প্রধান কথা। দেহ যে পরিমাণে মনের সহায়তা করে, বাহ্য-জগতের অনুশীলন করিতেও মন বিশেষ ভাবে উন্নত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-মন শ্রীভগবানের পদে আকৃষ্ট হওয়াই পরম পুরুষার্থ, উহাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ ঐ দিকে অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী হইল; নচেৎ সকলই সভ্যতার ভাণমাত্র। ইহা মানব-সমাজ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করে, ততই মঙ্গল।

শ্রীশশধর রায়।

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা।

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না, এবং লোক কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়। অতএব শারীরিক শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। এ স্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না; উপযুক্ত আহার গ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম-অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্রাম লওয়া, যথা সময়ে নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি যে সকল কার্য্য দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষ লাভের বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদায়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞানলাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবীর পক্ষে শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটে না; এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম যথানিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আহার নিদ্রার সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন সহ্য হয় এবং অনেক সহজ কার্য্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় এক প্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়ম পালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বলা যায় না।

নিয়মিত আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দ্বারা অনেক দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। হস্ত চক্ষুর সুশিক্ষা দ্বারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে শিক্ষা না করিলে চিত্র করা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরলরেখাও টানিতে পারা যায় না।

মন যেমন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ, মানসিক শিক্ষাও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়। এস্থলে মানসিক শিক্ষা, বিদ্যা শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক-শিক্ষা তদতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তিবর্দ্ধন এই দুইটিই বুঝায়। উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মানসিক শিক্ষা লাভ হয়। যথা—দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে অভ্যাস দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক্ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না বিদ্যাশিক্ষা যদিও অনেক সময়েই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবিচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনা দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্দ্বারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায়, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে, এক শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাসভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি? এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানসিক-শিক্ষা কেবল বিষয়-বিশেষের জ্ঞান লাভ নহে, সকল বিষয়েই

জ্ঞান-লাভের শক্তি-বর্দ্ধন ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্তি-বর্দ্ধনের উপায় নানা বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়ই যথাসাধ্য আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্রকৃতস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি কম থাকিলে চলা ভার। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞান-লাভ সহজে হয় না।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও যাহার নীতি কলুষিত, সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন—

" দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥ "

" দুর্জ্জন বিদ্বান্ হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে ভয়ঙ্কর নহে ? " নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দুর্নীতি কাহাকে বলে, তাহা স্থির করা প্রায়ই সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন তাহার কারণ এই যে, নৈতিক শিক্ষা-লাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি ইহা জানিলেই সম্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ যাহা সুনীতি তাহার আচরণ করা ও যাহা দুর্নীতি তাহার পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষা-লাভের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে পারা বহু যত্ন ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মবিষয়ক। তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। যদিও

দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রকৃত জ্ঞান-লাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যে সকল যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক, তদুপযোগী মনের শান্তভাব দুর্নীত ব্যক্তিদিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না। তাহারা সূক্ষ্ম কথা ধরিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের স্থূল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। তাহারা কুতর্ক করিয়া কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তি দ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধ হয় এই জন্যই আর্য্যঋষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। শান্ত, ঋজু এবং দম্ভবর্জ্জিত না হইলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন না; অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক-শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতেন না। আর একটি কথা আছে। দুর্নীত ব্যক্তির জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং নৈতিক-শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

নৈতিক-শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং নীতি শিক্ষা দ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। সত্য বটে নীতিশিক্ষাদ্বারা দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু নীতি-শিক্ষা যে আলস্য অপব্যয়াদি-সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাদিজনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া দারিদ্র্য ও রোগনিবারণে সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবদুর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে

তজ্জনিত দুঃখভার সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা কিছুতেই জন্মে না, এবং সেই ক্ষমতা এই সুখদুঃখময় সংসারে বড় অল্প মূল্যবান্ সম্পদ নহে।

এতদ্ব্যতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে, দৈব-দুর্বিপাকাদি আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতিভোজনাদি অসংযত-ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, অতিলোভ, ঈর্ষা, দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা তীব্র মনোবেদনা সহ্য করি। দ্বিতীয়তঃ পরের দুর্নীতির জন্য অপমান, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদি দ্বারা অর্থনাশ, শত্রুহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্যের দুর্নীতির ফল। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তিদমন শিক্ষা না করিলে, কেবল বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না।

৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃষীকেশ

হৃষীকেশে অনেক পুরাতন মন্দির আছে; সেগুলি যে কতকালের তাহা ঠিক জানা যায় না। এই সকল মন্দিরের মধ্যে "ভরতজীর" মন্দির প্রধান; ইনি রামের ভাই ভরত নহেন; যে ভরতের নাম অনুসারে "ভারতবর্ষ" হইয়াছে, ইনি সেই ভরত। কিছুদিন আগে এখানে একটি থানা ও পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে; একটি ছোট বাজারও এখানে আছে; যাত্রিবাসের জন্য কতকগুলি পাকাবাড়ী দেখিলাম। অধিকাংশ বাড়ীই বহু পুরাতন। কত কালের প্রাচীন স্মৃতি এই সকল অট্টালিকার শৈবালের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে এবং কত ভক্ত-হৃদয়ের ভাগবতস্তোত্র এখানকার বায়ুতরঙ্গে পরম পিতার অনাদি সিংহাসনতলে উত্থিত হইয়াছে! ভরতজীর মন্দিরের কাছে আর একটি অধিকতর পুরাতন জীর্ণ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম; মাটির ভিতর অনেকটা বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু যতটুকু এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাতে প্রাচীন হিন্দু-জাতির ভাস্কর-বিদ্যায় দক্ষতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এ মন্দির কত কালের তাহা কেহই বলিতে পারে না; প্রবাদ, শঙ্করাচার্য্য এটি প্রস্তুত করান এবং তিনিই তাহাতে প্রথম ভরতজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; সে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বহুকাল পরে অন্য মন্দিরটিতে ভরতজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অনেকটা রামচন্দ্রের মত। এ দু'টি মন্দির ভিন্ন রাম-সীতার আর একটি মন্দির আছে, তাহার অবস্থিতি অতি সুন্দর স্থানে; তাহার নীচেই একটা ঝরণা আছে, তাহাতে গরম জল

আসিয়া গঙ্গায় পড়িতেছে। এই ঝরণা-সম্বন্ধে একটা গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। একজন সিদ্ধ-যোগী এখানে তপস্যা করিতেন; তিনি প্রতিদিন গঙ্গা ও যমুনায় স্নান করিয়া পূজায় বসিতেন। গঙ্গা নিকটে বটে, কিন্তু যমুনা এখান হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে; যোগী যোগবলে প্রত্যহ প্রত্যূষে সেখানে স্নান করিতে যাইতেন। কিছুদিন পরে, যমুনা-দেবীর মনে কৃপার উদ্রেক হইল; তিনি যোগীকে বলিলেন "তোমাকে আর কষ্ট করিয়া এতদূর স্নান করিতে আসিতে হইবে না, তোমার আশ্রমের নীচেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" যোগী কিছু সংশয়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার কথার প্রমাণ?" যোগী দেবীর আদেশে নদীজলে একটি ফুল ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর নিজের আশ্রমে আসিয়া দেখেন সেই ফুল ধীরে ধীরে ঝরণা বহিয়া ভাসিয়া আসিয়া গঙ্গাজলে পড়িয়াছে। এ গল্পের সত্যাসত্য বিচার অনাবশ্যক, তবে এই ঝরণার জলের সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার সংযোগ থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়। অনেকে এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া থাকেন।

হৃষীকেশের উত্তরে গঙ্গাতীরে তপোবন। এই তপোবনে মহামুনি ব্যাস সশিষ্যে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এখানে অন্যান্য বড় বড় মুনি-ঋষিরও আশ্রম ছিল। আমি যে সময় এখানে আসি, তাহার অল্পদিন পরেই হরিদ্বারের সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা বসিয়াছিল, এই উপলক্ষে এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিলাম। বৎসরের অধিকাংশ কালই হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক সন্ন্যাসী বাস করেন। এখানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু গভীর, অতি স্বচ্ছসলিলা, উপলখণ্ডসঙ্কুলা ও প্রখরবাহিনী এবং পাড় অত্যন্ত উচ্চ। নানা দেশের ধনবান্ লোকে এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার কয়েক মাস সদাব্রত খুলিয়া রাখেন, সুতরাং সাধুগণের আহারের কোন অসুবিধা হয় না; প্রতিদিন দুইপ্রহরের সময় সদাব্রত হইতে

শ্রীজলধর সেন।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

দুই তিনখানি রুটি ও একটু ডাল, কোথাও বা একটু শাক প্রত্যেককে দেওয়া হয়। অনেকেই সদাব্রতে উপস্থিত হইয়া আহার্য্য লইয়া যান। কতক সাধু আছেন তাঁহারা বাহির হন না,—সদাব্রতের লোক তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া খাদ্যদ্রব্য দিয়া আইসে। আমি হৃষীকেশে যাইয়া দেখি, প্রায় পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী তখন সেখানে বাস করিতেছেন। আমাদের পৌছানর পূর্ব্বেই অনেক লোক-সমাগম হওয়ায় কোন ধর্ম্মশালায় আমরা স্থান পাইলাম না; অবশেষে কোন সদাব্রতের একজন প্রধান কর্ম্মচারী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সদাব্রতে আমাদের আশ্রয় দিলেন। সেখানে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, শুধু রান্নাঘর ও জিনিষপত্র রাখিবার একটা ভাঁড়ার; সদাব্রতের লোকজন তাহারই মধ্যে থাকে এবং আমিও সেইখানে আশ্রয় পাইলাম। এই সদাব্রতের অধিকারী একজন জৈন, তিনি সেখানে তাঁহার উক্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের উপরেই সমস্ত কাজের ভার দিয়া রাখিয়াছেন; ইনি অতি মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং বিনয়ী; সংসারত্যাগী অনেক সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাঁহাকে বেশী ভক্তি হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল।

স্নানাহার শেষ করিয়া সন্ধ্যার একটু আগে তপোবন-দর্শনে বাহির হওয়া গেল। গঙ্গার উপরই শাল, বেল, তমাল, অশোক, চম্পক, আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ-পরিশোভিত, নয়ন-তৃপ্তিকর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এক দিকে কলনাদিনী, প্রখরবাহিনী ভাগীরথী, অপর দিকে হিমাচল ক্রমোন্নত হইয়া গগনতল স্পর্শ করিয়াছে; শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে এই প্রদেশ আচ্ছন্ন; প্রাঙ্গণগুলি অতি পরিষ্কার; সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত কুটীরে ও পর্ব্বত-গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া যে মধুর দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর কখন ভুলিব না। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল—পর্ব্বতের বৃক্ষ-চূড়ায় স্বর্ণমুকুটের ন্যায় তাহার শেষ আলোকচ্ছটা

দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম শত শত সাধু-সন্ন্যাসী নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; কেহ গীতা বা উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, কেহ গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কেহ বা ধ্যান-পরায়ণ। অমর-কবি কালিদাসের সন্ধ্যা-তপোবন-বর্ণনা আজ আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। দূরে তেমনই বায়ুহিল্লোলিত, শ্যামল তরুরাজিশোভিত প্রান্তর, বৃক্ষশাখায় তেমনই সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুর সান্ধ্যকাকলী, ইতস্ততঃ তেমনই চঞ্চলনেত্র হরিণশিশুর নির্ভয় পাদচারণ, আর বহুদূরবর্ত্তী শালবনে দলবদ্ধ ময়ুরের সহর্ষ কেকাধ্বনি! এই সমস্ত মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি স্থান, কাল বিস্মৃত হইলাম; আমার মনে হইল, আমি যেন বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজত্ব অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া এক বহু প্রাচীন, ব্রাহ্মণপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, অপৌত্তলিক জাতির সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে প্রাচীন কবির বর্ণিত সকলই অল্পাধিক-পরিমাণে দেখিতে পাইলাম; দেখিলাম না, কেবল নীবার-মুষ্টি প্রত্যাশায় উটজ-দ্বাররোধী মৃগকুলের অভীষ্ট-ফলদাত্রী করুণাস্বরূপিণী ঋষিপত্নীগণ, সরলা ঋষিকুমারীগণের সযত্ন আলবাল জল-সেচন এবং আতপাগমে কুটীর-প্রাঙ্গণে রাশীকৃত নীবারধান্য।

এখানে কোন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আছেন কি না জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল; একটি সাধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে কিয়দ্দূরে একটি কুটীরের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আমি বাহিরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলাম। অল্পক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া একটি বাঙ্গালী যুবক বাহিরে আসিলেন। এই দূরদেশে সন্ধ্যার সময় একজন অপরিচিত স্বদেশী লোক দেখিয়া প্রথমে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং আমাকে সাদরে কুটীরের ভিতর লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া দেখি, তাঁহারা তিন জনই বাঙ্গালী, এক জন

আমার পূর্ব্বপরিচিত, এমন কি আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই; তিনি কোথায় আছেন, তাহা জানিতাম না,—অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ তাঁহাকে পাইয়া এখানে এই মধুর সন্ধ্যায় প্রাণ ভরিয়া বাঙ্গালা কথা কহিয়া মনের খেদ মিটাইতে লাগিলাম।

তার পরদিন আমাদের হৃষীকেশের উত্তরে "লছ্‌মন্‌ ঝোলা" যাইবার কথা। অতি প্রত্যূষে সন্ন্যাসীদিগের সেই পবিত্র আশ্রমের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শত সহস্র সন্ন্যাসী সেখানে বাস করিতেছেন, অথচ একটু কলরব মাত্র নাই; দেখিয়া ভাবি আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমরা তিন জন মানব-সন্তান একত্র থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তিতে এমন হট্টগোল লাগাইয়া দিই যে, দিগন্ত কাঁপিয়া উঠে; আর এখানে শত শত মনুষ্য বৃথাবাক্যব্যয় বন্ধ করিয়া যে রকম ভাবে দৈনিক কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন কতকগুলি কলের পুতুলকে একত্র সাজাইয়া রাখিয়া কলে ঘোড়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই সকল নির্ব্বাক পুতুলগুলি নিয়ামকের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছে। আর কিছু না হউক, আজ প্রভাতে এই সন্ন্যাসীদের ব্যবহার দেখিয়া এইটুকু শিক্ষালাভ করা গেল যে, বাক্যসংযম চিত্তসংযমের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে। দেখিলাম সন্ন্যাসীরা কেহ স্নান করিয়া মৃদু স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ বা কুটীর-সম্মুখে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কোন স্থানে উলঙ্গ সন্ন্যাসী অনাবৃত প্রান্তরে যোগমগ্ন রহিয়াছেন। এই শীতের দিনে দুই প্রস্থ পুরু কম্বল গায়ের উপর টানিয়া দিয়াও শীতের জ্বালায় আমরা "হী হী" করিতেছি, আর ঐ মনুষ্যপ্রবর অনাবৃত নদী সৈকতে ভয়ানক বরফ-পাতের মধ্যে প্রচণ্ড শীতে অনায়াসে বসিয়া আছেন। মানুষ লোকালয়ের প্রতিপত্তি লাভের জন্য নানা

রকম কঠোরতা অভ্যাস করিতে পারে এবং সেরূপ করিতেও দেখা যায়; সাধারণের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত কত জন কত রকমে তাহাদের শরীরকে বিকৃত করিয়া থাকে। অনেক সময়ই আমরা প্রবঞ্চিত হই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপরও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। কিন্তু লোকালয় হইতে এত দূরে, এ ভাবে কঠোরতা সাধন করিবার আর যে কোন উদ্দেশ্যই থাক, সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রলোভন যে তাহাদের নাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বনের বৃক্ষশ্রেণী ও বিহঙ্গম এবং পূতসলিলা ভাগীরথী ভিন্ন আর কেহ এখানে উপস্থিত নাই, এবং এই পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে কোন পার্থিব স্বার্থও যে সিদ্ধ হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই এই নির্জ্জন স্থানে সমাহিতচিত্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার মনে ভারি ভক্তির উদ্রেক হইল। আমি তাঁহার মুখে দেবত্বের ছায়া দেখিতে লাগিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

পরিশ্রমের মর্য্যাদা।

সকল প্রকার কায়িক শ্রম আমাদের দেশে অমর্য্যাদাকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রম যে আত্মসম্মানের অণুমাত্রও হানি-জনক নহে, এবং মানুষের শক্তি, সম্মান ও উন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট ভিত্তি, এ বোধ আমাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যত্র মানব-সমাজ শ্রমসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া সৌভাগ্যের সোপানে উঠিতেছে; আর আমরা কায়িক-শ্রম ঘৃণা করিয়া দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবিতেছি। যাহারা শ্রমবিমুখ বা পরিশ্রমে অসমর্থ, জীবন-সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য্য। এই নির্ম্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে, অযোগ্যের পরিত্রাণ নাই। যাহারা যোগ্যতম, তাহারাই বাঁচিবার অধিকারী; এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরিশ্রমের অমর্য্যাদা আত্মহত্যারই নামান্তর। 'কায়িক-শ্রম ভদ্রলোকের জন্য নহে,' এই ধারণা আমাদের সমাজে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভদ্রসন্তান খাটিয়া খাইবে, আমরা এ কথা চিন্তা করিতেও পারি না! শত অপমান সহিয়া চাকরী করিব, চির-জীবন অভাব ও উপেক্ষার করাঘাত সহিব, অন্যের গলগ্রহ হইয়া অশেষ কষ্ট পাইব, তথাপি স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কথা ভাবিতেও পারিব না। উহাতে কেবল আমার অপমান নহে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্ভ্রম-নাশ ঘটিবে। এই কুসংস্কার ও দূষিত-বিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

ভদ্রত্বের এমন অকল্যাণকর ও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা এখন পৃথিবীর আর কোথাও নাই। মানুষের চরিত্র, আচরণ এবং অন্তর্নিহিত মহত্ত্বই তাহার ভদ্রত্বের পরিচায়ক। শুধু পূর্ব্বপুরুষের দোহাই এবং আভিজাত্যের আস্ফালনে আর চলিবে না। কর্ণ বলিয়াছিলেন—

" সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা কোবা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্॥"

আমি সূত, সূতপুত্র অথবা যাহাই হই না কেন, উচ্চকুলে জন্ম দৈবায়ত্ত, কিন্তু পৌরুষ আমারই আয়ত্ত। এই দুর্জ্জয় বিশ্বাসের বলেই কর্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইউরোপের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে শ্রমের (Labour) প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রমজীবীরা আর 'মজুর' বলিয়া অবজ্ঞাত নহে। তাহাদের মত এবং অধিকার এখন রাষ্ট্রীয় সভায় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত বিবেচিত হয়। কারণ, সমাজের কোন প্রকার উন্নতিই শ্রম-নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব এবং জাতির স্থিতি ও পুষ্টির মূলে শ্রমসামর্থ্য, এই মহাসত্য ইউরোপ ও আমেরিকা বুঝিয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন্ সামান্য মজুরের কাজ করিতেন। উত্তরকালে এই দরিদ্র শ্রমজীবী আপনার চরিত্র, প্রতিভা এবং যোগ্যতার প্রভাবে যুক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কায়িক শ্রম উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞার বিষয় হইলে, লিঙ্কন্ সমগ্র দেশের কর্তৃত্ব লাভের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহামতী গ্লাডষ্টোন্ স্বহস্তে বড় বড় মোট বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধার অণুমাত্রও অপচয় ঘটে নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বাল্যকালে উদরান্নের জন্য কারখানায় মজুরি

করিতেন। ভবিষ্যতে তিনি পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছিলেন। যন্ত্রবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা যাহাদের সাধনায় এত উন্নত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শ্রমজীবিরূপে জীবনের প্রারম্ভে উদরান্ন সংস্থান করিয়াছিলেন।

রুষ-সাম্রাজ্যের স্বনামধন্য অধিপতি পিটার দি গ্রেট্ রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় স্বয়ং কর্ম্মকার ও সূত্রধরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিদেশে কঠোর কায়িক-শ্রমের বলে নৌনির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইউ-রোপের এই মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ দেশের নৌবিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত শ্রমজীবীর কায়িক পরিশ্রম করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই! আমাদের দেশেও পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরমহাশয় এবং ভক্তিভাজন ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়প্রভৃতি প্রভূত সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়াও কায়িক-শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতেন। আমরা যাহাকে 'ছোট কাজ' বলি, তাঁহারা সেই কাজগুলি স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

কলিকাতার বড়বাজারের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দোকানে বসিয়া স্বয়ং দুই এক টাকা মূল্যের কম্বল বিক্রয় করিতেন; আর তাঁহার কর্ম্মচারীরা দ্বিতল কক্ষে শালপ্রভৃতি বেচিত। এই আপাতবিসদৃশ ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, অল্প মূল্যের কম্বল প্রতি দিন হাজার হাজার বিক্রীত হয়। সুতরাং উহাতে চৌর্য্য ও প্রতারণার সম্ভাবনা অধিক। তাঁহার নিজের অর্থ যাহাতে অপহৃত না হয় এবং ক্রেতারাও কোনও ক্রমে প্রবঞ্চিত হইতে না পারেন, সেই নিমিত্তই তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা তিনি স্বয়ং দোকানে বসিয়া স্বহস্তে অল্প মূল্যের কম্বল বেচিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে একটি মূল্যবান্ প্রবাদ প্রচলিত আছে—

" খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়,
বসে খাটায় অর্দ্ধেক পায় ;
ঘরে থেকে পুছে বাত,
এবার যেমন তেমন,
আর বার হা ভাত ! হা ভাত ! "

এই সাধারণ গ্রাম্য প্রবাদটিতে বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা বসিয়া খাটাইতে অথবা ঘর হইতে 'বাত পুছিতে' চাই, সেই নিমিত্তই আমাদের 'যেমন তেমন' অথবা 'হা ভাত ! হা ভাত !'

পাশ্চাত্য মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন—'Labour is sacred. Labour is honourable.'—কায়িক শ্রম পবিত্র এবং সম্মানকর। ইউরোপীয় সাহিত্যের অসংখ্য গ্রন্থে শ্রমের মর্য্যাদা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ উভয়ের প্রভাবে, লোকে শৈশব হইতেই শ্রমের মর্য্যাদা শিখিয়া থাকে। এই কাজ ভদ্রলোকের, আর ঐ কাজ ছোটলোকের, এরূপ পার্থক্য পাশ্চাত্যভূখণ্ডে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বহু মেধাবী ছাত্র অন্যের গৃহে কাপড় কাচিয়া, বাসন মাজিয়া, গৃহ মার্জ্জনা করিয়া আপনাদের অধ্যয়ন ও ভোজনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে ভদ্র সমাজে তাঁহাদের কোনও রূপ অনাদর বা অসম্মান সহিতে হয় না। আমাদের দেশে শ্রমের মর্য্যাদাবোধক দৃষ্টান্ত ও উপদেশ উভয়েরই অভাব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য আমাদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যে গুণে পাশ্চাত্য জাতিরা এত শক্তিমান্ ও উন্নতিশীল, তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা তাহাদের বিলাস-ব্যসনের অনুকরণ করিতে গিয়া, নিজেদের দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছি, আমরা সেই নিমিত্ত বিলাস-মোহে অন্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং স্বীয় শ্রমসামর্থ্য হারাইতেছি।

এই বিলাসব্যাধি নব্যশিক্ষিতগণের মধ্যেই সমধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। বিষ যেমন শরীরের একস্থান হইতে ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, বিলাসবিষও তদ্রূপ সমাজদেহের সকল অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে।

কি কঠোর শ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ ইংরেজ তাহার এই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমরা ইংরেজী সভ্যতার বাহ্য-বিলাসের অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া সেই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই। সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া, সকল বাধায় উপেক্ষা দেখাইয়া, ইংরেজ-নাবিক পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের পণ্যভাণ্ডার বহন করিয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকা এবং ভীষণ তরঙ্গে তাহার শ্রমসামর্থ্য ও সাহস অবসন্ন হয় নাই।

ইংরেজের উপনিবেশ এখন পৃথিবীর চারি দিকেই বিস্তৃত। এই উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সুখ-সম্ভোগ বা বিলাস-চরিতার্থতার আখ্যায়িকা নহে। জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হইতে বহু দূরে, দুর্গম অরণ্য-সমাচ্ছন্ন হিংস্র পশুদিগের আবাসভূমি, উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠাতৃগণ তাহাদের অপরাজেয় পরিশ্রমে মানববাসের যোগ্য করিয়া লইয়াছে। বন-পরিষ্কার, ভূমি-কর্ষণ, গৃহ ও পথাদি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমের কাজ তাহারা স্বহস্তেই করিয়াছে। প্রত্যেককেই কৃষক, মজুর, সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কাজ করিতে হইয়াছে। জীবন-যাত্রার একান্ত অপরিহার্য্য কয়েকটি উপাদান ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাদের ভাগ্যে জোটে নাই। এইরূপ দুর্জ্জয় শ্রমের পাথেয় লইয়া তাহারা উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। যে সম্পদ ও বিলাসের ছটায় আমরা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহার মূলের বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা 'কার্ণিশের' শোভা দেখিতেছি, কিন্তু যে গভীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা না বুঝিয়াই আমাদের দুর্গতি।

অনেকে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন-যাপন অপেক্ষা কায়িক শ্রমে

অন্নসংস্থান অধিকতর নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই বিপরীত ধারণা যত শীঘ্র আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততই মঙ্গল। সকলেই এখন অভাবে জর্জ্জরিত, সুতরাং যাহারা পরগলগ্রহ হইয়া থাকিতে চায় তাহাদের জীবন ইতিমধ্যেই যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছে। সকলকেই এক্ষণে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "যদি চাকরী পাই তবেই ত স্বাবলম্বী হইব, তাহা না হইলে কি করিব?" তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, কায়িকশ্রম অসম্ভ্রমকর, এই কুসংস্কার দূর হইলে এবং শ্রমের মর্য্যাদাবোধ জন্মিলেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব, ভগবান্ কেবল চাকরী করিবার জন্যই আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। স্বাবলম্বনের ক্ষেত্র কিরূপ বিস্তৃত এবং কত প্রকারের কার্য্যশক্তি আমাদেরই মধ্যে, আমাদের অজ্ঞাতভাবে, নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

বহুকাল শ্রমবিমুখ হইয়া এবং শ্রমমূলক কার্য্য অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া, আমরা ক্রমে শ্রমসাধ্য কার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছি। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, স্বাস্থ্য ও শ্রমসামর্থ্য। সকল প্রকার উন্নতি ও সুখ ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহারা এই অমূল্য দান উপেক্ষায় ও অশ্রদ্ধায় নিষ্ফল করিয়া ফেলে, তাহাদের মত অভাগা জগতে আর নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নূতন নূতন শ্রমশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, কত নূতন প্রতিভা এবং নূতন শক্তি তাহার উন্নতি ও বিস্তৃতির কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। আমাদের দেশে পুরাতন যাহা ছিল, তাহাও এই নূতনের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া, ক্রমেই লোপ পাইতেছে। যাহা এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহা "ছোটলোক"-দিগের হস্তে। ভদ্রসমাজ সম্ভ্রম-নাশ-শঙ্কায় তৎসম্বন্ধে উদাসীন। কেবল কলম পিষিয়া এবং হিসাব-নিকাশ অথবা নকলনবিশী করিয়া, কোনও সমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

শ্রমসামর্থ্যের বিনাশ. এবং স্বাস্থ্যহানি এবং চরিত্রের উচ্চতর বৃত্তিসমূহের বিলোপ, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

ভারতবর্ষ এখন আর বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। জগতের কর্ম্মপ্রবাহে, বিশেষতঃ প্রতিযোগিতার আবর্ত্তে, ভারতবর্ষও পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীদিগকে অন্যান্য উন্নতিশীল জাতিগণের অনুরূপ গুণ অর্জ্জন করিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল গুণের মূলে শ্রমসামর্থ্য ও শ্রমের মর্য্যাদাবোধ।

ইউরোপে সারাসেন সভ্যতা।

মুরেরা যখন সারাসেন্ সভ্যতা লইয়া স্পেনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বর্ব্বরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারিত করিয়া সুতন্ত্রিত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। রোমান্ রাজ্যের এবং আদিযুগের খ্রীষ্টান্ রাজ্যের কৃষকপ্রমুখ শ্রমজীবিগণ, ভূমাধিকারীদিগের দাসমাত্র ছিল; কোন সম্পত্তিতে এই দাসদিগের অধিকার ছিল না; এই জন্যই সমাজের যথার্থ স্তম্ভস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক রাজার পর অন্য রাজার অধিকার হইলেও কিছুমাত্র ব্যস্ত বা দুঃখিত হইত না। মুসলমান-অধিকারে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের দাসত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল। হজরত মহম্মদের অনুশাসন এই, যে ব্যক্তি দাসের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবে অথবা তাহার উন্নতিতে বাধা দিবে, সে কদাচ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। মুসলমানরাজ্যে এক দিন যে দাস, সে অন্যদিন সম্রাট্ পর্য্যন্ত হইতে পারে; ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্পেনের কৃষকেরা মস্লেমদিগের নববিধানে আপনার আপনার ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিল, এবং ইচ্ছা করিলেই তাহারা আপনার ভূমি দান বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিত। এ ব্যবস্থাও হইয়াছিল যে, মুসলমান হইলেই দাসের দাসত্বের শেষ চিহ্নটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই দেশের নিম্নশ্রেণীর সকল লোকেরাই যথার্থতঃ রাজভক্ত হইল এবং অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। "বার্গর্স" বা মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও প্রভুদিগের খামখেয়ালীর উৎপীড়ন

হইতে রক্ষা পাইয়া নির্ভয়ে আপনাদিগের গৃহে ধন এবং সুখ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। ভূমিবিধি, দণ্ডবিধি, শাসনবিধি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ান্-মোস্লেম অভেদে প্রযুক্ত হইত এবং কাহাকেও স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণের জন্য বা প্রচারের জন্য তিলমাত্র বিড়ম্বিত হইতে হইত না। রাজ্যশাসন এবং প্রজারক্ষার এই নীতি ইউরোপখণ্ডে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্পেন্‌রাজ্যের মোস্‌লেম শাসনকর্ত্তা আবদর রহমন অষ্টমশতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ফরাসীরাজ্য অধিকার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

ফরাসীদেশের সে সময়ের কথঞ্চিৎ সভ্য অধিবাসীরা স্পেনের খ্রীষ্টিয়ান-দিগের মত বর্ব্বরযুগের বলিষ্ঠতা হারাইয়া নির্বীর্য্য হয় নাই; ফ্রান্স সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক চার্লস্ মার্টেল্ (অর্থাৎ গদাঘাতদক্ষ চার্লস) বিশেষ শৌর্য্যে এবং পরাক্রমে ফরাসীদেশ হইতে চিরদিনের মত মুসলমান আক্রমণ দূরীভূত করিয়াছিলেন। অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শারলেমন্ একবার স্পেনজয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত স্পেনরাজ্যে অক্ষুণ্ণ মোস্‌লেম শাসন চলিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মোস্‌লেম অধিপতিগণ কি ভাবে এবং কত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং মোস্‌লেম রাজ্যের আত্ম-বিদ্রোহে কিরূপভাবে স্পেনরাজ্যে এবং অন্যত্র শাসন-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বের যুগে স্পেনদেশে কিরূপ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, স্থূলভাবে সেই কথাই কিছু কিছু বলিব।

খালিফের শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত না হইয়া যখন স্পেনরাজ্যে

স্বতন্ত্র সুলতানের রাজ্য আরব্ধ হইয়াছিল তখন হইতেই বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রথম সুলতান আব্‌দর রহমানের সময় হইতে সুলতান হাকামের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ন্যায়শাসন এবং জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। দলে দলে সুপণ্ডিত এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শিগণ পারস্য এবং আরব প্রভৃতি স্থান হইতে নব মুসলমানরাজ্যে আসিয়া প্রতিভার পুরস্কার লাভ করিতেছিলেন। ৮২২ খ্রীষ্টাব্দে হাকামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আব্‌দর রহমানের সময়ে অনেক পণ্ডিত এবং শিল্প-কুশলী সুলতানের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিবিধ বিভাগের জ্ঞানচর্চ্চা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-চর্চ্চা ত চলিতে ছিলই, তাহা ছাড়া নৃত্য গীত এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, দেশের সর্ব্বত্রই সঙ্গীতাদি আদৃত হইতেছিল। প্রাচীন সময়ের অর্দ্ধ-বর্ব্বরদিগের সৌন্দর্য্যানুভূতি একটু অতি মাত্রায় বাড়িয়াছিল মনে হয়। সুলতানের একজন লঘুচেতা সভাসদ্‌, পরিচ্ছদ পরিবার, কেশবিন্যাস করিবার এবং কথা কহিবার রীতিসম্বন্ধে যে পদ্ধতিটি আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন, তাহাই দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে অনুকরণ করিত। স্পেনদেশে পূর্ব্বে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত; সারাসেনেরা কাচের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিল; এবং কাচের ভোজন ও পানপাত্র, দীপদান এবং আয়না প্রভৃতি ইউরোপ-খণ্ডের মধ্যে স্পেনদেশেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিবিধ সুস্বাদু রাঁধিবার রীতিও সারাসেন্‌ পাচকেরা প্রথম শিখাইয়াছিল।

সারাসেন্‌ প্রভাবে, স্পেনদেশে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং জ্ঞানপিপাসায় যে কর্ডোভা নগরে ইউরোপ খণ্ডের অনেক লোক শিক্ষার্থী হইয়া আসিতেন, ইউরোপের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। তখন চিকিৎসা-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল এবং ইউরোপের অন্যত্র অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিল বলিয়া, একালের ইউরোপীয়

পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সে সময়ে কিরূপ হর্ম্ম্য রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব হইলেও একটুখানি বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

দশম খৃষ্টশতাব্দীতে যখন ইউরোপের অধিবাসীরা জ্ঞানে এবং ব্যবহারে বর্ব্বর ছিল এবং লোকেরা কাঠের ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে মলিন ভাবে বাস করিত, সেই সময়ে স্পেনদেশে মোস্‌লেম সভ্যতার অতি আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হর্ম্ম্যাদির গৌরবের আভাস দিবার পূর্ব্বে আর একটি কথার উল্লেখ করিতেছি স্থলতানেরা যে সকল রমণীয় উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি একাধারে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাক্ষী। পৃথীবির যে স্থানে যে রমণীয় বৃক্ষলতা বা সুস্বাদু ফলের গাছ পাওয়া যাইত, তাহা স্পেনদেশে আনিয়া সুকৌশলে বাড়ান হইয়াছিল।

প্রথম সুল্‌তান 'আব্‌দর' রহমানের সময়ে যে রমণীয় মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও কর্ডোভানগরে তাহা লুপ্ত হয় নাই। কর্ডোভানগরে ধনী ব্যক্তিদিগের ৫০০০০ হাজার সুনির্ম্মিত হর্ম্ম্য ছিল, সাধারণ লোকের লক্ষাধিক আবাসগৃহ ছিল, ৭০০ শত মস্‌জিদ বা উপাসনালয় ছিল এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৯০০ শত স্নানাগার ছিল। কর্ডোভা-নগরের নিকটে নদীর উপরে যে মনোহর এবং দৃঢ়নির্ম্মিত সেতু রচিত হইয়াছিল আজিও তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আব্‌দর রহমানের সময়ে যে মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল উহা এখনও ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া স্বীকৃত। এই মস্‌জিদ্‌টি বহু প্রসারিত খিলানে নির্ম্মিত এবং উহার ১২৯৩টি স্তম্ভ এখনও সৌন্দর্য্যে মনোহর হইয়া রহিয়াছে। উহার কারুকার্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব, এবং যে সকল বহুমূল্য ধাতু এবং প্রস্তরে ঐ মস্‌জিদ ভূষিত হইয়াছিল অংশতঃ তাহা

ইতিহাসেই পড়িতে হয়। রাত্রিকালে উপাসনার সময়ে অনেক ঝাড়-লণ্ঠন ত জ্বলিতই, তাহা ছাড়া মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে যে মোমের বাতিটি দিবারাত্র জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইত, সেটির ওজন পঁচিশ সের হইত। মস্‌জিদের মেঝে এবং দেওয়ালে যে সকল সুমার্জ্জিত মার্ব্বেল প্রভৃতি পাথর বসান হইয়াছিল এখনও তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হয়।

কর্ডোভার উপকণ্ঠে একটি উপনগর বসাইয়া, তৃতীয় আব্‌দর রহমান তাঁহার পত্নী এজ্‌-জেহারার (তিলোত্তমা) নামাঙ্কিত করিয়া যে প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই এ কালের লোকে স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হয়। যাহা সৌন্দর্য্যে অতুল ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে যাহাদের প্রাণে বাধে নাই, সেই রূঢ় ব্যক্তিদিগের বংশধরেরা এখন এজ্‌-জেহারার একটি অংশ কারাগাররূপে ব্যবহার করিতেছেন। সুলতানের এই প্রাসাদটি যে চারিহাজার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলি বহুদেশে হইতে আনীত দুর্লভ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভের সংখ্যাতেই প্রসার সূচিত হয় বটে, তবুও ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বার সংখ্যায় ১৫০০০ হাজার ছিল! প্রাসাদের মধ্যভাগের 'হল্' বা দালানটির কেন্দ্র-স্থলে একটি নাতিবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত করিয়া সেই সরোবরটি পারদে পরিপূর্ণ রাখা হইত। উজ্জ্বল ধাতু এবং মণিমুক্তা-খচিত গৃহে যখন আলোক পড়িত, তখন সে আলোক পারদ এবং মণি-মুক্তায় প্রতিফলিত হইয়া যে দীপ্তি বিকাশ করিত, বহুদূর হইতেও তাহার প্রভা অতি পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হইত। প্রাসাদের চারি দিকে উদ্যান এবং কৃত্রিম নির্ঝরগুলির শোভার বর্ণনায় এক একজন ঐতিহাসিক এক এক অধ্যায়ই লিখিয়াছেন।

সাদ্রাসেন সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ মুরদিগের জ্ঞানচর্চ্চার কথা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি; তথাপি সুলতান হাকামের পাঠাগারের একটু উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যে যুগে পুস্তক ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন সুলতানের পাঠাগার চারি লক্ষ গ্রন্থে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে বিভিন্ন বিদ্যার গ্রন্থ বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া অথবা বহুব্যয়ে নকল করাইয়া আনা হইত; এবং কোন কবি নূতন কাব্য রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিলেই, সুলতান সেই কবিকে বহু অর্থ দান করিয়া বিদেশ হইতে আনাইয়া তাহার রচিত গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা খানি পাঠাগারে রাখিতেন। পাঠাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই সুলতান নিজে পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থের পার্শ্বে পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক টীকা লিখিতেন। গ্রন্থগুলি তাঁহার টীকায় অমূল্য হইয়াছিল, একথা অনেক আরবী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। মোস্লেম-প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল গ্রন্থ অপাঠ্য এবং পরিত্যাজ্য বোধে অপসারিত করিয়াছেন। সারাসেন সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি স্পেনদেশে বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু মুরদিগের প্রভাবে যে জ্ঞান এবং কৌশল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একালের ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম স্তর, সেই জ্ঞান ও কৌশলের মহিমায় রচিত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বন ও বৃষ্টি।

তরুলতাচিহ্নরহিত উন্মুক্ত প্রান্তর অপেক্ষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অধিকাংশ বৃষ্টি পাত হয়,—এই কথাটা আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই উক্তির মূলে কতটা সত্য আছে, বিজ্ঞানগ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না।

বৃহৎ-দেশের বৃষ্টিবাত্যাদি-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যবায়ু (Trade-winds) প্রভৃতি স্থায়ী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বত-শ্রেণীতে দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহচালিত মেঘরাশি বাধাপ্রাপ্ত হয়,—এবং তাহারই ফলে ঘাটসন্নিহিত স্থানে প্রচুর বারিপাত দেখা যায়। এই জন্যই দক্ষিণাপথের বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ গড়ে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক না হইলেও ঘাটের নিকবর্ত্তী প্রদেশের বারিপাত প্রায়ই ৮০ ইঞ্চিরও অধিক হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কয়েক বর্গ-মাইল বিস্তৃত বনভূমি এবং ঠিক সেই স্থানেরই সম-আয়তন-বিশিষ্ট একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ তুলনা করিলে উভয়ে যে একতা দেখা যাইবে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। পরীক্ষা করিলে বনাবৃত-ভূমির বারিপাত-পরিমাণ. উন্মুক্ত-প্রান্তরে পতিত-বৃষ্টির তুলনায় নিশ্চয়ই অধিতর দেখা যায়।

এখন দেখা যাউক, বৃক্ষশূন্যস্থান অপেক্ষা বনভূমিতে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণ কি। পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, মিছ্‌রি বা ফট্‌কিরি প্রভৃতি

কোন দানাদার পদার্থ জলে মিশ্রিত করিলে এবং তাহাতে উক্ত পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর হইলে,—সেই পদার্থই আবার জলের মধ্যে আপনিই দানা বাঁধিয়া যায়। কিন্তু সেই মিশ্রিত পদার্থকে যদি স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই দানা সঞ্চিত হয় না;—দানা বাঁধাইবার জন্য বাহির হইতে একটা উত্তেজনা আবশ্যক, সেই উত্তেজনার দ্বারা একবার দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, জলমিশ্রিত সমস্ত পদার্থটা ক্রমে দানাময় হইয়া যায়। এই জন্য মিছ্‌রি প্রস্তুত করিতে হইলে, দানা উৎপাদনের উত্তেজনাস্বরূপ একখণ্ড সূত্র চিনির রসে নিক্ষেপ করিতে হয়; এবং প্রচুর ফট্‌কিরি পুনরুৎপন্ন করিতে হইলে, মিশ্রপদার্থটাকে কিঞ্চিৎ আলোড়িত করা বা তাহাতে তজ্জাতীয় একখণ্ড দানাদার পদার্থ নিক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জঙ্গলকীর্ণস্থানের অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল প্রচুর-জলীয়বাষ্পপূর্ণ মেঘে,—সেই চিনির রসে নিক্ষিপ্ত সূত্রের ন্যায় কার্য্য করে। যখন আকাশের নিম্নস্তরস্থ বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশি বায়ুপ্রবাহে চলিতে থাকে, বর্ষণের জন্য তখন ইহাতে আর নূতন বাষ্পসঞ্চারের আবশ্যকতা থাকে না; বর্ষণারম্ভের জন্য কেবল একটা উত্তেজনার অভাব থাকিয়া যায় মাত্র। তাহার পর উচ্চ বৃক্ষশিরে আহত হইয়া সেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মেঘই ভূমিতে বর্ষণ করিতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত যে কারণে বায়ুচালিত মেঘরাশি পর্ব্বতপার্শ্বে প্রতিহত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণ করে, সেটাকেও আরণ্যভূমির বর্ষণাধিক্যের কারণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে,—এই প্রকার বর্ষণ উপকূলস্থ বনভূমি ও অরণ্যবহুল দ্বীপে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। এই ত গেল বাহ্যশক্তিজাত বর্ষণাধিক্যের কথা। ইহা ছাড়া বনভূমিতে অধিক বর্ষণের আরও কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রৌদ্রতাপে বনভূমির বৃক্ষপত্রাদি হইতে প্রতিদিন যে

জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া আকাশস্থ হয়, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, সেই বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইয়া বর্ষণ করিলে, তথাকার দৈনিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় এক ইঞ্চি হইয়া পড়ে। পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিন কি পরিমাণে জলীয়-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা সুন্দর পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষায় প্রথমে কোন এক সজীব বৃক্ষশাখা একটি জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে অহোরাত্র নিমজ্জিত রাখা হয় এবং পাত্রে কি পরিমাণ জল আছে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা হয়। তাহার পর উক্ত সজীব শাখার শোষণের জন্য পাত্রের জল কতটা কম পড়িল, তাহা ঠিক করা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা-পদ্ধতিক্রমে গণনা করিলে দেখা যায়,—একটি পরিণত বৃক্ষ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিদিনই প্রায় ৫৫ মণ জল পত্রমূলাদির-দ্বারা শোষণ করিয়া লয় এবং ঠিক সেই পরিমাণ জলই প্রতিদিন বাষ্পাকারে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে।

স্থানীয় উষ্ণতা এবং পরীক্ষাস্থলের বায়ু ও আকাশের অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সহিত উৎপন্ন বাষ্পের পরিমাণও পরিবর্ত্তিত হয়,—এই জন্য পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষালব্ধ গণনায় অল্পাধিক ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিনিয়তই যে, প্রভূত জলীয়-বাষ্প আকাশস্থ হইয়া মেঘোৎপত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৎসরের নানা সময়ে শীত প্রধান দেশের অরণ্যতলের অবস্থা পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শীত-কালে ঐ সকল আরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থানই যেন সদ্যোবর্ষণে সিক্ত থাকে, কিন্তু অপর ঋতুতে, এমন কি বর্ষাকালেও, তথায় তদ্রূপ আর্দ্রতা দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক বলেন, ঋতুবিশেষে শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদের জলশোষণশক্তির অত্যধিক হ্রাসবৃদ্ধি হয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি আমরা দেখিতে পাই। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্তু সেই

ঋতুতে বৃক্ষাদির জৈবক্রিয়া পূর্ণভাবে চলিতে থাকে, কাজেই ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার সকলই উদ্ভিদ্‌মূল দ্বারা শোষিত হইয়া যায়; অরণ্যতলে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যদি জলসঞ্চিত জলের তুলনায় বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদিস্থ স্থান অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও জলশোষণের বিরাম হয় না,—উদ্ভিদ্‌সকল স্বতঃই সদ্য-উদ্গত শাখাপত্রাদিতে ভূষিত হইয়া সমগ্র জলের স্থান সংকুলান করিয়া লয়। এই প্রকারে অতিবর্ষণ-সত্ত্বেও অরণ্যতল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌কে শীতের প্রারম্ভ হইতেই ভ্রষ্টপত্র হইয়া সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহাদের মূলে আর পূর্ব্ববৎ রসাকর্ষণ-শক্তি থাকে না,—কাজেই সৌরকিরণে বাষ্পীভূত এবং ভূশোষিত হওয়ার পর, যে জল উদ্বৃত্ত থাকে তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া অরণ্যতলকে আর্দ্র করিয়া তোলে। শোষণাভাবে বর্ষণবিরল শীতকালেও যে সকল বৃক্ষের তল পঙ্কিল হইয়া পড়ে, এবং অজস্র-বারিপাত-সত্ত্বেও যে সকল বৃক্ষের জলশোষণশক্তিসাহায্যে বর্ষাকালেও বনভূমি শুষ্কপ্রায় থাকিয়া যায়, সেই সকল আরণ্যবৃক্ষদ্বারা প্রতিদিন কত জল শোষিত হইয়া বাষ্পীভূত হইতেছে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ এখন কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—অসংখ্য আরণ্যবৃক্ষ-পরিত্যক্ত উল্লিখিত বিশাল বাষ্পরাশি বনভূমিতে বর্ষণাধিক্যের আর একটা কারণ।

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন,—এক সীমাবদ্ধ স্থানের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্পরাশি জমাইয়া তরলীভূত করিবার স্থূলতঃ দুইটি উপায় আছে।

প্রথম চাপপ্রয়োগ, দ্বিতীয় শৈত্যসংযোগ। একটা গোলকের মধ্যবর্ত্তী আবদ্ধ বাষ্প বরফ দ্বারা শীতল কর। শৈত্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে, বাষ্প জমিয়া যাইবে। আবার সেই বাষ্প সঙ্কুচিত করিয়া বা বাহির

করিয়া বা বাহির হইতে গোলকে আরও বাষ্প প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার চাপ বৃদ্ধি কর, তাহা হইলেও দেখিবে, বাষ্প তরলীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশ প্রচুর মেঘে আচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ষণ নাই,—ইহার কারণও পূর্ব্বোক্ত চাপ বা শৈত্যের অভাবব্যতীত আর কিছুই নয়, শীতল-বায়ু-সংস্পর্শাদি কারণে সেই বাষ্পরাশির তাপের হ্রাস হইলে বা বাষ্প সঞ্চারিত হইয়া তাহার চাপ বৃদ্ধি করিলে, সেই মেঘই আবার জলে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উষ্ণতাধিক্য বা চাপস্বল্পতাপ্রযুক্ত বর্ষণের অনুপযোগী উল্লিখিত মেঘসকল যখন বায়ুবিতাড়িত বনভূমির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, আরণ্যবৃক্ষ-পরিত্যক্ত সেই প্রভূত বাষ্পরাশি তাহাতে সংযুক্ত হইয়া বর্ষণোপযোগী চাপের অভাব পূরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তদ্দ্বারা বনভূমিতে প্রচুর বারিপাত হইয়া যায়।

বাষ্পীভূত হইবার সময় পদার্থমাত্রেরই তাপের ক্ষয় হয়—স্নানের পর গাত্রসংলগ্ন জল শারীরিক ও বাহ্য তাপে বাষ্পীভূত হইবার সময় সেই তাপের অনেকটা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এই জন্য আমরা স্নানান্তে বেশ একটা শৈত্য অনুভব করিতে পারি। সেই প্রকার বৃক্ষপত্রাদিস্থ জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হইবার সময় আরণ্যভূমির উপরিস্থিত বায়ুরাশির অধিকাংশ তাপই অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং কাজেই তদ্দ্বারা আরণ্যবায়ুতে একটা স্নিগ্ধতার উৎপত্তি হইয়া যায়। এই স্নিগ্ধতা বনভূমির বর্ষণাধিক্যের অন্যতম কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘরাশি ভাসিতে ভাসিতে বনভূমির উপরিস্থ সেই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র শীতল হইয়া যায়,—কাজেই এই অবস্থায় বনভূমিতেই অধিক বর্ষণ হইয়া পড়ে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নিশীথে আগন্তুক।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে যাইতে না পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, ইহাই আরংজীবের উদ্দেশ্য।

এক দিন শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। ক্রমে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল। দিল্লীর প্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগরে ব্যাপ্ত হইল। নৈশ নিস্তব্ধতায় গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এমন সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ-অন্ধকার আকাশ-পটে যেন দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি। বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন আগন্তুকের মস্তকে জটাজূট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা কোন প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণ-নয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরেও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন—

"মহারাজের জয় হউক!"

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-শব্দ শুনিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল; বিপদের সময়, চিন্তার সময়, এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বার দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?

পরে শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে বোধকরি, আপনি পলায়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।"

সীতা। "প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "সে উপায় কি?"

সীতা। "অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর; কিন্তু পূর্ব্বদিকে সেই প্রাচীরে লৌহ-শলাকা স্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসাধ্য নয়। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে, নিমেষ-মধ্যে মথুরায় পৌঁছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন। তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।"

শিব। "আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম। আপনি

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

যে প্রকৃত বন্ধু আহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন, প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইলে, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীব-হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।"

সীতা। "প্রাচীরে যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায়, বা গতি রোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।"

শিব। "ভাল, নৌকায় গমন-কালে যদি তীরস্থ কোন প্রহরী সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?"

সীতা। "অষ্টজন নৌকাবাহক, ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "মথুরায় পৌঁছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। "আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন। তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পাঠ করুন।"

রস্ত্রের ভিতর হইতে সীতাপতি একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি পাঠ করিয়া শুনান।" সীতাপতি লজ্জিত হইলেন। তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না। কখন লেখা-পড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মথুরেশ্বরের কুটুম্ব-সমস্ত স্থির করিয়াছেন। পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন, "গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে

অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থ, প্রিয় সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী, আমার সেনারা কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।”

সীতা। “আপনার পুত্র, প্রিয় সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর, আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে; আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলেও হানি নাই। আরংজীব তাঁহাদিগকে লইয়া কি করিবেন? অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।”

শিব। “সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না। তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।”

সীতা। “যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু যে, আপনার নিরাপদ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?

শিবজী নীরবে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন—“গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম। কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন! নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।”

সীতা। “অন্য উপায় নাই।”

শিব। “তবে সময় দিন। শিবজীর এ প্রথম বিপদ নহে। শিবজী উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।”

সীতা। "সময় নাই, অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন। নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।"

শিব। "আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না। কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থও হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত ও প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।"

সীতা। "প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তি-দান করুন,—সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমর-তরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে।"

শিব। "সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন; আমার কথা অবধারণ করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই,—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।"

সীতা। "প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী!"

শিব। "তাহাই হউক,—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।"

"তবে আদেশ দিন আমি বিদায় হই।" অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু!

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

সাগরিকা।

মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূল হইতে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বহুবিস্তৃত মহাসাগর-বক্ষে যে অসংখ্য দ্বীপাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনও কোনও গ্রন্থে ও মানচিত্রে "ভারত-দ্বীপপুঞ্জ" নামে উল্লিখিত। দ্বীপগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে, একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়াই কথিত হইতে পারিত। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে একত্র এরূপ দ্বীপ-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষুব-রেখার উপরে ও সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত হইলেও, এই সকল দ্বীপ প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বলিয়া কথিত হইতে পারে। উত্তর-পশ্চিমের ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের সাগর-সমীরণ গ্রীষ্মতাপ প্রশমিত করিয়া বৃষ্টিপাত নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য প্রকৃতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। বৃক্ষলতার প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে বাহ্য দৃশ্য মনোহর হরিদ্বর্ণে সুশোভিত;—অল্পায়াসলব্ধ ফলশস্যে অধিবাসিগণ নিয়ত আত্মতৃপ্ত;—বাণিজ্য-বিপণীর অগণ্য পণ্যসম্ভারে বেলাভূমি ক্রয়বিক্রয়-কোলাহলে নিরন্তর মুখরিত।

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে আমেরিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইবার সমসময়ে এই প্রাচ্য পণ্য-বীথিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে যে সকল পাশ্চাত্য-নাবিক সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণে বহির্গত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট ইহার সন্ধানলাভ করিবামাত্র, বহু বণিক্-সমিতি প্রাচ্য বাণিজ্য করতলগত করিবার প্রবল প্রলোভনে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কালক্রমে সমগ্র

প্রাচ্য সাগরবক্ষে তাহাদিগের অপ্রতিহত অধিকার সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

তৎপূর্ব্বে,—বহুকাল পর্য্যন্ত—প্রাচ্য সাগরবক্ষে ভারতবর্ষের প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের লুপ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থে তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভের উপায় নাই। কিন্তু ভারত-দ্বীপপুঞ্জের শিল্পে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে, এখনও তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব, ভারতবাণিজ্যের অনুযাত্রী হইয়া মরুগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপৎ-সঙ্কুল-স্থলপথে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সকল স্থলে তাহার স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া, জলপথেও কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে তাহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের যেরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য-সম্বন্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। তদুপলক্ষে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে ভারতীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়া, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে, একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষ গঠিত হইয়াছিল। তাহার অনুকূল কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না। নৈসর্গিক শোভায় ও অপর্য্যাপ্ত শস্যসম্পদে, এই নাতিশীতোষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পক্ষে উপনিবেশ-সংস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। যে যুগে এই উপনিবেশ-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা মানব-সমাজের ইতিহাসের পূর্ব্বতন যুগ;—তৎকালে উপনিবেশ-সংস্থাপন-ব্যাপারেও ভারতবর্ষ সকলের অগ্রগণ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, তাহারা

"নিগ্রিটো" জাতীয়,—খর্ব্বকায়, কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিতকেশ, অসভ্য মানব। তাহাদিগের পক্ষে ভারতীয়গণের উপনিবেশ-সংস্থাপন-চেষ্টার গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা বরং ভারতীয়গণের আশ্রয়লাভ করিয়া শিক্ষায় সমুন্নত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎসূত্রে তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে "মঙ্গোলীয়" ও "ককেশীয়" মানবের সংমিশ্রণ সাধিত হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের সুদীর্ঘ সংসর্গ-প্রভাবে তাহাদিগের অবস্থা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রভাবাপন্ন হইলেও অনেক বিষয়ের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা ও অপরিহার্য্য নৈসর্গিক পার্থক্য এখনও তদ্দেশে সভ্যাসভ্য দুইটি পৃথক্ মানব-সমাজের উৎপত্তি-তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে।

ভারতবর্ষের সহিত ভারত দ্বীপপুঞ্জের এই সুদীর্ঘ সংসর্গ মানব-সমাজের ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলে, মানব-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান লাভের পর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায়, তদ্দেশের ভূতত্ত্বের, জীবতত্ত্বের ও উদ্ভিজ্জতত্ত্বের আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে;—প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারত সংসর্গ-সূচক পুরাতত্ত্বের আলোচনা এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় ভারত-দ্বীপপুঞ্জেরও লিখিত ইতিহাসের অভাবে, পুরাকাহিনী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোনও কোনও পুরাতন খোদিত-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে ভারত-লিপি ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত হইয়াছিল। এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা এখনও পুরাকালের ভারত-সংসর্গের

অভ্রান্ত নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান আছে। একটি দ্বীপে ইহার পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বাচার্য্যগণ [ইংরাজী হইতে অক্ষরান্তরিক করিতে বাধ্য হইয়া] " বালি-দ্বীপ " বলিয়া এই দ্বীপটির নামকরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম [বলবান্‌গণের বাসস্থান] বলী দ্বীপ। "উশনাবলী" ও "বলী সংগ্রহ" নামক তদ্দেশের দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পর, এই নাম-রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই দ্বীপের সমুদ্রোপকূল নিয়ত তরঙ্গ-সঙ্কুল বলিয়া তাহা সহসা শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারিত না ;—অধিবাসিগণও শিক্ষায়, সভ্যতায় ও বাহুবলে পরাক্রান্ত বলিয়াই পরিচিত ছিল। তজ্জন্য এখানকার হিন্দুরাজ্যের গৌরব-দীপ অনেক দিন প্রজ্বলিত থাকিবার পর, সম্প্রতি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন রাজশক্তি ওলন্দাজগণের করতলগত। কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও পূর্ব্ব প্রতাপেই বর্ত্তমান আছে। এখানে কিরূপে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার লিখিত ইতিহাস এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাহার প্রথম উপক্রমে, যাঁহারা যবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া, বলী দ্বীপে আসিয়া, তথায় হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই দ্বীপে এখনও হিন্দু-সভ্যতার প্রধান নিদর্শন—সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় উপনিবেশনিচয়ের পুরাকাহিনীর সন্ধান লাভ করিতে হইলে, বলী দ্বীপ হইতেই তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিতে হইবে। আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও এই কারণে, বলী দ্বীপের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

যাঁহারা বলী দ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে স্বধর্ম্ম-রক্ষক সংস্কৃত গ্রন্থাবলী রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আয়োজন করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। মাতৃ-ভূমির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর, বলী দ্বীপের হিন্দু-সমাজের পক্ষে গ্রন্থ-রক্ষার চেষ্টা একটি অবশ্য প্রতিপালনীয় পবিত্র ব্রতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এখনও সংস্কৃত গ্রন্থ বংশানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তথ্যানুসন্ধানের অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতবর্গ এই সকল সযত্ন-রক্ষিত গ্রন্থের পরিচয়-গ্রহণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্নে অনেক গ্রন্থের পাঠ ও প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার আশা নাই। তাহা স্মরণাতীত পুরাকালের কথা। রামায়ণের ন্যায় অতি পুরাতন গ্রন্থে যবদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, রামায়ণের রচনাকালে তাহার জনশ্রুতি কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখন হয় ত কেবল বাণিজ্য-সম্বন্ধই বর্ত্তমান ছিল। উত্তরকালে উপনিবেশ-সংস্থাপন সেই সুদীর্ঘ বাণিজ্য-সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। তাহাকে এক দিনের বা এক যুগের ঘটনা বলিবার উপায় নাই। তজ্জন্যই ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উপনিবেশসমূহে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক স্তরে, প্রবল পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য-প্রভাব পূর্ব্বকালবর্ত্তী সকল প্রভাবকেই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তৎপূর্ব্বে আরবগণের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। তাহাতেও তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী ভারতীয়-প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ প্রতাপে

বর্ত্তমান ছিল, ভাষা ও সাহিত্য হইতে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। আচার-ব্যবহারে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, জনসমাজের পরম্পরাগত বিবিধ মতে ও বিশ্বাসে, এখনও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে। তাহার সাহায্যে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারত-সংসর্গের বিবরণ সঙ্কলনের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল, এবং তৎসূত্রে নানা স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও সংস্থাপিত হইয়াছিল,— এ সকল কথা সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোকে ভারত-দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

লক্ষ্মণ।

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল-মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্ত্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম দুর্ব্বল ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাম-চরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আদ্যন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ রসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্য্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধ রাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায় আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এইরূপ পৌরুষহীন মোহ-প্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন - তাহা এক দিকে যেমন সুগভীর ভালবাসা-ব্যঞ্জক,—অপর দিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না," "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে," "পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদি-

রূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে করিবে?"

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু ভর্ত্তা ও পিতা সকলই রামচন্দ্র।"

"অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ।"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য-প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাপ, অনশনকৃশ

ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ স্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পরিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চির-সুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন?" এই লক্ষ্মণই পূর্ব্বে—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন॥"

বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট এক দিন বলিয়াছিলেন - "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইত। তিনি রামের প্রতি অন্যায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তিমাভ

কোবিদার বিকশিত হইল,—মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে তরঙ্গিণীরা মন্দগতি হইল, কুসুমশোভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে গীতশীল ষট্‌পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরিসানুদেশে বন্ধুজীবের শ্যামাভ ফল দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্দ্রের নিকট শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি শীর্ণ হইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা সহজ হইবে, সুতরাং—

"সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষেঽহম্"

সুগ্রীব ও নদীকুলের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রামচন্দ্র শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—গ্রাম্যসুখে রত মূর্খ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। লক্ষ্মণকে তিনি সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বন্ধুকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক কয়েকটি কথা ছিল—

"ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালীপথমন্বগাঃ॥"

'যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই, সুগ্রীব, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনুসরণ করিও না।' কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা "পুনশ্চ" জুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন—

"তাং প্রীতিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্।
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়েঃ॥"

"প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ব্বসখ্য স্মরণ করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগপূর্ব্বক

সান্ত্বনাবাক্যে সুগ্রীবের সঙ্গে কথা কহিও।" এই সাবধানতার কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।"

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎর্সনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদনপূর্ব্বক তখনই রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ব্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃপ্ত মহিমা সর্ব্বত্র অনাবিল,—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র। সীতা কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ূরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই,-সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদবন্দনাকালে তাঁহার নূপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।" কিষ্কিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিঃস্বন শুনিয়া—

"সৌমিত্রিঃ লজ্জিতোঽভবৎ।"

এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার-তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সত্ত্বেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হইয়া পড়ে

নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক-রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।" এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

ক্ষাত্রতেজের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ, ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছে। "রামসীতা" এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় "রাম লক্ষ্মণ" এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে "লক্ষ্মণ" অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পরমান্ন,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণশূন্য করিতেছি। যাহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ একগৃহে স্থান পাইতেছেন না! হায়! কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্‌রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণ-থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন! আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,—লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল মহর্ষি

বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ দেবতা-স্বরূপ তুমি এই পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,—সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশিস্ বর্ষণ করিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কিরীটেশ্বরী।

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া যে স্থলে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন, যথায় নগরস্থ সহস্রদ্বার সৌধাদির প্রতিবিম্ব নদীবক্ষে পতিত হইয়া রমণীয় শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে, তাহারই অপর পারে "ডাহাপাড়া" নামক একটি পল্লীগ্রাম অবস্থিত। ডাহাপাড়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ। এককালে এই ডাহাপাড়া মুর্শিদাবাদ-রাজধানীর অন্তর্গত হইয়া, বহুসংখ্যক অট্টালিকায় বিভূষিত ছিল। তৎকালে মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিতি করিয়া, আপনার গৌরব ও সমৃদ্ধি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিত। উক্ত ডাহাপাড়া হইতে প্রায় সার্দ্ধ-ক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়; তাহার নাম কিরীটকণা। কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গল-পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহার এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র মনঃপ্রাণ শান্ত-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, কি এক অনির্ব্বচনীয় রসে অন্তরাত্মা আপ্লুত হইয়া উঠে! স্থানটি জঙ্গলময় হইয়াও যেন শান্তিনিকেতন; শান্তিদেবী যেন ইহাতে চির আবাস-স্থান স্থাপন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এরূপ বৈরগ্যোদ্দীপক স্থান অতি বিরল। এই স্থানে কতিপয় প্রাচীন মন্দির জীর্ণাবস্থায় থাকিয়া, মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেয়। কিরীটকণা মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি প্রাচীন স্থান। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, দক্ষযজ্ঞে বিশ্বজননী পতিপ্রাণা সতী প্রাণত্যাগ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে

নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইসময়ে দেবীর কিরীটের একটি কণা এই স্থলে পতিত হয়, তজ্জন্য ইহা উপপীঠ মধ্যে গণ্য, এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী কিরীটেশ্বরী বলিয়া এতদঞ্চলে কীর্ত্তিতা। কিরীটেশ্বরী যেন সমস্ত মুর্শিদাবাদেরই অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপা ছিলেন। যতদিন তাঁহার গৌরব ছিল, তত দিনই মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধি, অথবা মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও এতদঞ্চল হইতে অন্তর্হিতা হইতে বসিয়াছেন। কিরীটকণা প্রথমাবস্থায় ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কেবল একটিমাত্র সামান্য মন্দির ইহাতে ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইত; উহা কতদিনের নির্ম্মিত, তাহা কাহারও জ্ঞানগোচর ছিল না। উপপীঠ ও জঙ্গলময় বলিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করিতেন, পরে ক্রমে ক্রমে মায়ের পূজার বন্দোবস্ত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গলবৈষ্ণব এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু যৎকালে বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের প্রধান কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর মহিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং কিরীটকণার প্রাচীন মন্দির সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান প্রধান মন্দিরগুলিও নির্ম্মিত হয়।

বঙ্গাধিকারিগণের মতে তাঁহাদের আদিপুরুষ ভগবান্ রায় মোগলকেশরী দিল্লীশ্বর আকবর সাহকে স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট করিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার কাননগো পদ ও "বঙ্গাধিকারী মহাশয়" উপাধি লাভ করেন। কিন্তু ভগবান্ রায় শাহ সুজার সময়ে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ভগবানের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ রায় কাননগো পদ ও সম্রাটের নিকট হইতে অনেক লাখরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহার মধ্যে কিরীটেশ্বরী "ভবানীথান" নামে লিখিত থাকে। বঙ্গ-

বিনোদের পর ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণ স্বীয় পিতার পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিনারায়ণের পর তাহার পুত্র দর্পনারায়ণ উক্ত কাননগো পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। দর্পনারায়ণের কার্য্যের শেষ ভাগে যৎকালে সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ আরঙ্গজেবের আদেশক্রমে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। নবাব আজীম ওশ্বানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলীর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মখসুদাবাদ বা মখসুদাবাদে (পরে মুর্শিদাবাদ) আগমন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানীসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মচারী মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন, অগত্যা দর্পনারায়ণকেও আসিতে হয়। এই সময়ে জগৎশেঠদিগের আদিপুরুষ শেঠ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব, জগৎশেঠ ও বঙ্গাধিকারিগণ মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও সম্মানীয় বংশ, এবং উক্ত তিন বংশেরই বাঙ্গালার শাসন ও রাজস্ব সম্বন্ধে একাধিপত্য ছিল। দর্পনারায়ণ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ডাহাপাড়ায় স্বীয় আবাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণ কিরীটেশ্বরীর নিকট অবস্থিতি করায় তাঁহার গৌরববৃদ্ধির অনেক চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়া, কিরীটেশ্বরীর প্রতি বাঙ্গালার সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গুপ্তমঠ নামে তাহার প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার, এবং কিরীটেশ্বরীর বৃহৎ মন্দির, শিব ও ভৈরব মন্দির সমুদায়ের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিরীটেশ্বরীর মন্দিরাভ্যন্তরে কালীঘাটের ন্যায় কোন স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল একটি উচ্চ বেদী ও তাহার পশ্চাতে একখণ্ড বিশাল

প্রস্তর ভিত্তির ন্যায় নানাবিধ শিল্পকার্য্য অলঙ্কৃত হইয়া, উচ্চভাবে অবস্থিতি করিতেছে; দেবীর কেবল মুখমাত্র বেদীর উপরে অঙ্কিত। বেদীর নিম্নে বসিবার স্থান ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহভিত্তির কতক দূর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত; মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত বারাণ্ডা আছে। শিবমন্দির-মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরখোদিত শিবলিঙ্গ ও ভৈরব-মন্দিরে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ভৈরবমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটি মন্দির ইহার নিকট জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত মন্দিরের নিকট " কালীসাগর " নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দর্পনারায়ণ রায় খনন করিয়া দেন। পুষ্করিণীটি যেমন বৃহৎ সেইরূপ গভীরও ছিল; মন্দিরের নিকট উহা কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, এক্ষণে তাহাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্করিণী শৈবাল ও পঙ্কে পরিপূর্ণ, জলও অপেয়। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরী-মেলার সৃষ্টি করেন; এই মেলা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে যাত্রীর সমাগম হইত। দোকানপসারিতে পরিপূর্ণ হইয়া কিরীটকণা অত্যন্ত গৌরবময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত। অদ্যাপি পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গল বারে উক্ত মেলা বসিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রাণহীন। বর্ষাকালে কিরীটেশ্বরী-গমনের পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হওয়ায়, লোকের গমনাগমনের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিত, সেই অসুবিধা নিবারণের জন্য দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ পথের সংস্কার ও একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে তাহা জঙ্গলপূর্ণ ও বৃক্ষাদির দ্বারা আচ্ছাদিত। শিবনারায়ণ মন্দিরাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার রাজত্বকাল হইতে কোম্পানীর সময় পর্য্যন্ত, শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কাননগো ছিলেন, তিনি সাধ্যানুসারে কিরীটেশ্বরীর সেবায় যত্ন করিতেন। তাহার পর যখন মুর্শিদাবাদের রাজধানীর গৌরব অন্তর্হিত হইয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, সে সময়

পলাশীর সমরক্ষেত্রে মুসলমান রাজলক্ষ্মীর কিরীট স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীরও কিরীট শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। পরিশেষে বঙ্গাধিকারিগণের দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারও গৌরবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমে কিরীটেশ্বরীর গৌরব লোপ পাইতে পাইতে অধুনা তাঁহার নামটিকে বহুকালশ্রুত প্রবাদবাক্যের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। যত দিন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তত দিন কিরীটেশ্বরীর গৌরবের সীমা ছিল না; বাঙ্গালার রাজমহারাজগণ, বণিক্‌মহাজনবৃন্দ রাজধানীতে সমাগত হইলেই কিরীটেশ্বরী দর্শনে গমন করিতেন। তৎকালে কিরীটেশ্বরী এতদঞ্চলে মহাতীর্থভূমি ছিল। এক্ষণে কলিকাতা ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া, কালীঘাটে যেরূপ অবিরত উৎসব হইয়া থাকে, মুর্শিদাবাদের গৌরবের সময়ে কিরীটেশ্বরীও তদ্রূপ নিত্যোৎসবময়ী ছিলেন। তখন রাজধানীর নহবতাদি বাদ্যধ্বনি কিরীটেশ্বরীর শঙ্খঘণ্টারোলের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীকে তালে তালে নৃত্য করাইত। যেমন মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, লোকে আনন্দ-উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত, সেইরূপ কিরীটেশ্বরীর দর্শনমাত্র তাহাদিগের হৃদয় শান্তভাবে ভরিয়া যাইত। এক দিকে যেমন রাজকর্ম্মচারিগণ কার্য্যব্যপদেশে প্রতিনিয়ত নগরমধ্যে গতায়াত করিতেন, সেইরূপ অপর দিকে দেবীর পাণ্ডাগণ যাত্রীর অন্বেষণ ও মায়ের সেবার আয়োজনে বহির্গত হইতেন। কিরীটেশ্বরী এইরূপ ঘোর কোলাহলময়, উদ্যমময়, উৎসাহময় নগরের নিকটে অবস্থিতি করিয়া, তাহার মধ্যে ধর্ম্মভাব ও শান্তভাব অনুপ্রাণিত করিয়া, মুর্শিদাবাদকে মধুর করিয়া তুলিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের নিকটেও কিরীটেশ্বরীর মহিমা অবিদিত ছিল না। নবাব জাফর আলি খাঁ তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বাসী মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের

অনুরোধে, অন্তিম সময়ে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া, চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এখন আর সে দিন নাই, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহিমাও যেন বিলীন হইতে চলিয়াছে। ভবানীর প্রিয়পুত্র নাটোররাজ রামকৃষ্ণ যে সময়ে রাজকার্য্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতেন, সেই সময়ে তিনি সাধনার জন্য কিরীটেশ্বরীতে গমন করিতেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তিনি একবার মন্দিরাদির সংস্কার করিয়া দেন। বৈদ্যরাজ রাজবল্লভের স্থাপিত দুইটি শিব-মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু কিরীটেশ্বরীর মন্দিরগুলি যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে যে সে সমস্ত অচিরাৎ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ কিরীটেশ্বরী এক্ষণে তাঁহাদের হস্তে নাই। ইহার আর সংস্কার হইবে কি না, জানি না। যদি কখনও মুর্শিদাবাদ পূর্ব্ব গৌরবের ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হয়, আবার যদি শিল্পবাণিজ্যে তাহার গৌরবজ্যোতিঃ দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা হইলে কিরীটেশ্বরীর কিরীট-ভ্রষ্ট-রত্ন পুনঃস্থাপিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

মনসুরের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ।

সাধকপ্রবর মনসুর নির্জ্জনে যোগ-সাধনে উপবেশন করিলেন; আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় ইন্দ্রিয়সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন রহিলেন। কেবল সেই একই ভাব, সেই ফল্গুনদীর অন্তঃ-প্রবাহ, সেই বাহ্য-জ্ঞানশূন্যতা, সেই ধ্যান স্তিমিতনেত্র!—নীরব ও নিস্পন্দ! মশক মক্ষিকাদিগের উপবেশনে দূরে থাক, দংশনেও গাত্র স্পন্দিত নহে। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর; এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত মাস, কত বৎসর চলিয়া গিয়া অনন্তকালের গভীর গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইল, জগতের কতস্থানে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কত মানবের ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু মনসুরের এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না, স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরন্তর নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট;—সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া নির্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র আনন্দোৎসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড বা কোনরূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও তদনুসরণে ধাবিত হইত না: ফলতঃ তিনি সংসারের আবিলা-জাল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্য-অন্তঃকরণে খোদার প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির গহ্বরাভ্যন্তরে অনলরাশি পরিপূর্ণ

হইলে, গিরি অগ্নি উদ্গিরণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? পাত্র পূর্ণ হইলে বারি স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আহা! এক দিবস অকৃত্রিম ধাম্মিক, প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুর প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন—"অনাল্ হক্" (অহং ব্রহ্ম বা আমিই ঈশ্বর)! উঃ কি ভীষণ অধর্ম্মের কথা! কি পাপের কথা!! কি স্পর্দ্ধাজনক অন্যায় উক্তি!!! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে—ইন্দ্রিয়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত দুর্ব্বল মানবে—জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে—ঈশ্বরত্বের অধিকার! গোষ্পদে বিশাল বারিনিধির আরোপ! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে? ভক্তের কি এই উক্তি? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে চাহিয়া রহিল, এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে আর বাকি রহিল না। যে শুনে সেই স্তম্ভিত, সেই হতচৈতন্য। নানা জনে, নানা কথা বলিতে লাগিল। বোগ্‌দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসমাজে এই একই কথা—একই বিষয়ের আন্দোলন। কেহ কেহ, 'হায় ধর্ম্মপ্রাণ মন্‌সুর পাগল হইয়াছেন" বলিয়া, শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ মন্‌সুরের সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভাই! তোমার মনে এই বিকৃতি জন্মিল কেন? তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি এক জন পরম জ্ঞানী, তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র! তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, সাবধান জান ত, এ ধর্ম্ম বিগর্হিত নিদারুণ পাপকথা। এ কথা পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এমন কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব স্থির হও, যাহাতে এই কুচিন্তা অন্তর হইতে বিদূরিত হয়, এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এ উক্তি তোমার পক্ষে,—

তোমার কেন, জগতের কোন লোকের পক্ষেই, মঙ্গল-জনক নহে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শত্রু করিও না, চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন কর।” ইত্যাকার কতই প্রবোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্থিতফণা ফণী মন্ত্রৌষধি গ্রাহ্য করিল না! এ মন্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না,—সকলই অসাধ্য ও ব্যর্থ হইল। প্রেমমুগ্ধ মন্‌সুর এ সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলিলেন না।

প্রবহমানা স্রোতস্বতীর দিগন্তগ্রাসী প্রবল প্রবাহ রোধ করে কাহার সাধ্য? তিনি নরলোক-দুর্ল্লভ শান্তি সুধাপ্রদ প্রেমপারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আছেন, লোকের নিষেধ বাক্যে সেই চিরসুখের স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুখময় সরলপথ ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করে? শত যত্নেও মন্‌সুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না; সুহৃদ্বর্গের উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

“ আনামান আহোয়া ওয়ামান্ আহোয়া আনা,
নাহ্‌নো রুহানে হালালনা বদানা।
ফা এজা আব্‌সারতানী আব্‌সার তাহু,
ওয়া এজা আব্‌সার তাহু আব্‌সার তানা।”

অর্থাৎ আমিই তিনি,—যাঁহাকে আমি চাহি—ভালবাসি; এবং যাঁহাকে আমি চাহি—ভালবাসি, তিনিই আমি। আমরা দুইটি আত্মা এক দেহে আছি। এই হেতু তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাঁহাকে দেখিবে, এবং যখন তাঁহাকে দেখ, তখন আমাকে দেখিবে।

ফলতঃ আমাকে দেখিলেই, তোমাদের তাঁহাকে দেখা হইবে। তোমরা আমাকে জীবনের ভয় দেখাইতেছ কি জন্য? আমার আবার জীবনের আশা কিসের?

আমার কি জীবন আছে? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি যে মৃত! মৃতের কি পার্থিব ভয় বা জ্বালাযন্ত্রণা আছে, না কখনও হইতে পারে? অথবা যদি আমার জীবন থাকে, তাহা ত অতি তুচ্ছ পদার্থ। যাহা এই আছে, পর মুহূর্ত্তে নাই, সে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মূল্যই বা কত? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও ত তাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না। সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য আবার ভয় কি? তাহার মমতা—যত্নই বা কি জন্য? ইহা বলিয়া ধর্ম্ম-মদমত্ত মনসুর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃপুনঃ "হক্ হক্ আনাল হক্" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীমোজাম্মেল হক্।

ধর্ম্ম-সঙ্গীতি।

উরুবিল্বের বোধিদ্রুমতলে ভগবান্ শাক্যসিংহ যে মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ ভারতের দ্বারে দ্বারে তাহা প্রচার করিবার পর অবশেষে তিনি কুশীনগরে উপনীত হয়েন। বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে কুশীনগরের শালতরুকুঞ্জে জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। অসংখ্য সাধু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই মহাসমাধি দর্শন করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাকাশ্যপসহ সাত লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু শোকাভিভূত হৃদয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণলাভের পর স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে বুদ্ধশিষ্যগণ পরিচালিত হইতেন। স্থবির কাশ্যপ বুদ্ধদেবের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ভগবান্ স্বহস্তে তদীয় প্রিয়তম শিষ্যকে তাঁহার নিজ-পরিহিত গৈরিক বাস পরিধান করাইয়া শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারের ভারও তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া, বুদ্ধশিষ্যগণ তদীয় ভস্মাস্থি নানা স্থানে বিতরণ করেন। মহাকাশ্যপ তাঁহার প্রতি তদীয় গুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া নিজের গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিলেন। কারণ, ভগবান্ সুগত তাঁহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর কালে যাহাতে ভগবান্ শাক্যসিংহ-প্রদত্ত অমৃতোপম উপদেশরাজি মানবের কল্যাণার্থে

শাস্ত্ররূপে নিবদ্ধ থাকে. এই পবিত্র ও গুরুতর উদ্দেশ্যের মহাপ্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, তিনি পাঁচশত বাসনা-বিমুক্ত ভিক্ষুককে সমবেত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষুকগণ সকলে সমাগত হইলে, মহাস্থবির কাশ্যপ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া, যাহাতে বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হয় এবং সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের নিমিত্ত অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর ভিক্ষুবর্গের মধ্যে যাঁহারা অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থ রাজগৃহে গমন করিতে কাশ্যপ আদেশ করিলেন। এই স্থানেই তাঁহারা প্রথম বর্ষাবাস যাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ও বর্ষাবাসের সময়েই সকলে সম্মিলিত হইয়া মহাকাশ্যপের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ তখনও অর্হতের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু আনন্দকে সকলেই ধর্ম্মসঙ্গীতিতে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলেরই ধারণা, আনন্দ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-সঙ্গীতির অধিবেশন পূর্ণ হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষুগণ ব্যতীত এখানে অন্য কাহারও উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল। তাহার পর পূর্ণিমাতিথিতে তাঁহারা সকলে রাজগৃহে সম্মিলিত হইলেন. কাশ্যপ-প্রমুখ স্থবিরগণ মগধরাজ অজাত শত্রুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তথায় বর্ষাবাসের তিনমাস যাপন করিবার অভিপ্রায়ে, বিহারাদির সংস্কার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু তাঁহাদের অনুরোধ শ্রবণমাত্র বিহারাদি পুনঃ-সংস্কারের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহা-সম্মুখে ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশনার্থ এক বৃহদায়তন সভাগৃহ নির্ম্মিত হইল। ভিক্ষুমণ্ডলীর উপবেশনার্থ বহুমূল্য নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত আসনাদিদ্বারা উক্ত সভাগৃহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। সভাগৃহের মধ্যস্থলে

পূর্ব্বমুখে ভগবান্ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অতি মনোরম এক আসন নির্ম্মিত হইল। বর্ষাবাসের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ক্রমে ভিক্ষুগণ সেই সুবৃহৎ ও সুশোভিত সভাগৃহে সকলে সমবেত হইলেন, কিন্তু আনন্দ তখনও তথায় উপস্থিত হন নাই। আনন্দের অনুপস্থিতির কারণ সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তন্মুহূর্ত্তেই অর্হৎ আনন্দ ঋদ্ধিপদ লাভপূর্ব্বক অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে শূন্যদেশে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই ধর্ম্মসঙ্গীতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পিটকত্রয়ের বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম সংগ্রহ করিবার ভার যথাক্রমে উপালি, আনন্দ ও মহাস্থবির কাশ্যপের উপর অর্পিত হইল। মহাকাশ্যপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উপালিকে বিনয়-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু উপালি তাঁহার প্রশ্নগুলির বিশদভাবে সমাধান করিলেন। এইরূপে বিনয়ান্তর্গত সমুদয় নিয়মাবলী সংগৃহীত হইল। মহাকাশ্যপ, স্থবির আনন্দকেও এই ভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আনন্দ তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলীর যথার্থ মর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপে সূত্র-পিটক সংগৃহীত হইল। বিনয় ও সূত্রব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিয়া মহাকাশ্যপ স্বয়ং তাহা অভি-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এইরূপে সপ্তমাসব্যাপী সঙ্গীতির অধিবেশন পূর্ণ হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র ব[illegible]

সাহিত্যরত্ন।

টীকা।

চিত্রদর্শন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১২২৭ সালে (১৮২০ খ্রীঃ অঃ) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ইঁহার জন্ম। নয় বৎসর বয়সে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। বাল্যে বিশেষ দারিদ্র্য-কষ্ট সহ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শ্রম ও প্রতিভার বলে সংস্কৃত ভাষায় ও বিবিধ শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। পৌরুষ, লোকহিতৈষণা ও স্বাবলম্বন তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার সুন্দর সুমার্জ্জিত শব্দসম্পদে ও কলাচাতুর্য্যে বঙ্গসাহিত্য নূতন ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" সকলের পাঠ করা উচিত।

পৃঃ ১। 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত। মহাকবি ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নামক সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে ইহা লিখিত।

আর্য্য—পূজ্য; পূজনীয়, সম্মানার্হ ব্যক্তিকে সম্বোধনের সময় ব্যবহৃত হয়।

দুর্ম্মনায়মানা—(দুর্‌-মন্‌+কঙ্‌+শানচ্‌, স্ত্রীলিঙ্গে আ) উদ্বিগ্নচিত্তা।

পৃঃ ২। জৃম্ভক—নিদ্রাজনক; এই অস্ত্রের প্রয়োগে শত্রু সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িত বলিয়া ইহার নাম 'জৃম্ভক'।

তাড়কা—সুকেতুর কন্যা, অসুর সুন্দের পত্নী, মারীচের মাতা, অগস্ত্য মুনির শাপে রাক্ষসী, যজ্ঞার্থী ঋষিগণের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত। বিশ্বামিত্র স্বীয় [illegible]র্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ইহার বধ সাধন করেন।

বিশ্বামিত্র—ইনি ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

আর্য্যপুত্র—স্বামী।

শতানন্দ—জনকের পুরোহিত।

মাণ্ডবী—জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভরতের স্ত্রী।

শ্রুতকীর্ত্তি—কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী।

ঊর্ম্মিলা—জনকের কন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী।

পৃঃ ৩। ভৃগুনন্দন—ভৃগুবংশজাত, জমদগ্নি-তনয়। পরশুরাম একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন করেন। তাঁহার ইষ্টদেবতা মহাদেবের ধনু এক ক্ষত্রিয়-বালক ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া ইনি রামের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন।

শৃঙ্গবের নগর—রামচন্দ্রের পরমমিত্র গুহকের রাজধানী।

পৃঃ ৪। অরণ্যব্রত—বানপ্রস্থ ব্রত।

কালিন্দী—যমুনা।

দক্ষিণারণ্য—বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণদিকস্থ বন।

জনস্থান—দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানবিশেষ।

পৃঃ ৫। পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের এক অংশের নাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিকের নিকট।

পৃঃ ৬। দণ্ডকারণ্য—রাজা দণ্ডক শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে অপহরণ করেন। এই জন্য শুক্রাচার্য্যের শাপে তাঁহার রাজ্য বনে পরিণত হইয়াছিল।

মাল্যবান্ পর্ব্বত—বোম্বাই প্রদেশে রত্নগিরি জিলায় অবস্থিত।

শকুন্তলা-বিদায়।

পৃঃ ৮। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। কালিদাস-প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে শকুন্তলা-বিদায় অতি করুণ ও মনোরম দৃশ্য।

শকুন্তলা—বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম। সদ্যোজাতা কন্যা জননী কর্ত্তৃক বনে পরিত্যক্তা হইলে এক শকুন্ত (পক্ষী) ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম শকুন্তলা। মহর্ষি কণ্ব ইঁহাকে স্বীয় আশ্রমে পালন করিয়াছিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার বাল্যসখী।

পৃঃ ৯। বনতোষিণী—শকুন্তলা স্নেহবশতঃ কোনও আশ্রমলতার এই নামকরণ করিয়াছিলেন।

পৃঃ ১০। শ্যামাক—শ্যামাধান।

পৃঃ ১১। গোতমী—মহর্ষি কণ্বের ভগ্নী।

হিমশিলা।

অক্ষয়কুমার দত্ত—১৮২১ খ্রীঃ অব্দে নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী "চুপী" গ্রামে ইঁহার জন্ম; মৃত্যু ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে। বহুকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ রচনা ও পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক ইনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের সাধনায় বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য ভাবে ও ভাষায় সমৃদ্ধ হইয়া এক্ষণে সর্ব্বজন-সমাদৃত, ইনি সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অন্যতম। ইঁহার ভাষা মার্জ্জিত ও সাধু।

পৃঃ ১৪। জনপদ—দেশ।

সম্বলিত—সহিত।

কুক্ সাহেব—বিখ্যাত নৌপর্য্যটক।

পৃঃ ১৫। গুণবৃক্ষ—জাহাজের মাস্তুল।

এস্কিমো—(Eskimo, Esquimaux) উত্তর আমেরিকা, গ্রীন্‌লণ্ড প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী এক জাতীয় লোক। ইহারা দেখিতে খর্ব্বাকার।

ধূমল—কৃষ্ণলোহিত বর্ণ।

পৃঃ ১৬। নিরাকরণ—নিবারণ, প্রতীকার।

অনির্ব্বচনীয়—যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব; বর্ণনাতীত।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—কলিকাতার যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমি[illegible] ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৮ বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ও বহু সুপণ্ডি[illegible]তায় তিনি মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। সিংহ মহাশয় এই মহাভারত বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগ ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

পৃঃ ১৭। তূষ্ণীম্ভাব—মৌনভাব; চুপ করিয়া থাকা।

মধুসূদন—শ্রীকৃষ্ণ মধুদৈত্যকে বধ করিয়া এই আখ্যা লাভ করেন।

নিঃস্বনে—স্বরে।

অবতংস—ভূষণ; কিরীট।

অযুক্ত—অন্যায়।

অনৃত—মিথ্যা।

পৃঃ ১৮। কৃপ—শরদ্বান ঋষির পুত্র; শান্তনু কর্তৃক পালিত। ইনি ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রাচার্য্য নিযুক্ত হন।

বিকর্ণ—দুর্য্যোধনের ভ্রাতা।

সোমদত্ত—জনৈক রাজা; বাহ্লিকের পুত্র। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সাত্যকির হস্তে নিহত হন।

বাহ্লিক—আফ্‌গানিস্থানের উত্তরপশ্চিমস্থ প্রদেশ; বল্‌খ্‌ হইতে হীরাট পর্য্যন্ত।

কলিঙ্গ—উৎকলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ দেশ।

কাম্বোজ—দেশবিশেষ; সগর-রাজ এই স্থানের যবন জাতির শিরশ্ছেদ করেন।

পৃঃ ১৯। কৃতাস্ত্র—অস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত।

পুত্র নির্ব্বিশেষে—পুত্রবৎ।

পৃঃ ২০। উৎপথগামী—কুপথগামী।

পৃঃ ২১। দাহিত—সন্তাপিত।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী; বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটে অবস্থিত।

[illegible]—পাশাখেলা।

[illegible]পেত—ন্যায়সঙ্গত।

কেশব—শ্রীকৃষ্ণ।

পৃঃ ২২। অপ্রতিবিধেয়—যাহার প্রতীকার নাই।

দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গল।

পৃঃ ২৩। জন্মপ্রভৃতি—আজন্ম, জন্ম হইতে।

পরশু—কুঠার।

পৃঃ ২৪। বৃকোদর—ভীম ; বৃক (বৃক নামক অগ্নি) উদরে যাহার।

ভূরিশ্রবা—রাজা সোমদত্তের পুত্র ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন।

ভাগ্য-গণনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত-শব্দ-বহুল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে সরস, প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য এবং অপূর্ব্ব ভাবে ও শব্দসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার শক্তি ও উপযোগিতাসম্বন্ধে সংশয় দূর করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত মাতৃভাষার সেবা ও অধ্যয়নের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং সাহিত্যিক। বঙ্গসাহিত্যে আজ আমরা যে নূতন জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, সে শক্তির উৎস বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সোনার কাঠির স্পর্শে বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সুপ্তাবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি 'আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশের অনুকূল করিয়া আমাদের দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন।'

পৃঃ ২৫। কল্লোলিনী—তরঙ্গিণী ; নদী।

সানুদেশ—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূভাগ।

পীতাম্বরী—হলদে রঙের কাপড়। (পীত-হলদে ; অম্বর-বস্ত্র।)

পৃঃ ২৬। দিব্য-পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত—(সুন্দর [illegible] দ্বারা সজ্জিত) দিব্য—সুন্দর ; আভরণ—অলঙ্কার ; ভূষিত—অলঙ্কৃত।

বিগুণ—প্রতিকূল।

পৃঃ ২৭। শ্রী—বঙ্কিমবাবুর "সীতারাম" গ্রন্থের একটী সুন্দর-চরিত্র। ইনি ভাগ্য-বিড়ম্বনায় স্বামি-পরিত্যক্তা।

কপালকুণ্ডলা।

পৃঃ ৩০। সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর—২৫০ বৎসর।

বহর—পোতশ্রেণী।

পৃঃ ৩১। "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য...কলঙ্করেখা"

"শোভিছে লবণসিন্ধু শ্যামকলেবর
লৌহচক্র প্রায়, দেখ, ব্যাপী দিগন্তর,
সুদূর গগনপ্রান্তে সূক্ষ্ম নীলিমায়
শোভে তীর বনরাজি পরিধির প্রায়।"

নবীনচন্দ্র দাস।

খারাবি—খারাপ।

বার দরিয়ায়—বার জলে, গভীর জলে।

পৃঃ ৩৩। পাঁচপীর—মাঝিদের উপাস্য বদর প্রভৃতি পাঁচজন পীর।

কলধৌতপ্রবাহবৎ—রজত ধারার ন্যায়; কলধৌত—স্বর্ণ; রৌপ্য।

পৃঃ ৩৪। প্রাগুক্ত—পূর্ব্ব-কথিত।

পৃঃ ৩৫। সম্ভাব্য কাল—যে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা সম্ভব সেই সময়।

পৃঃ ৩৬। তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গের আঘাত।

স্বেদশ্রুতি—ঘর্ম্ম-নিঃসরণ; ঘামপড়া।

সন্তানের শিক্ষা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাইকেল মধুসূদন [illegible] সহপাঠী ছিলেন। স্কুলবিভাগের সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইনি ক্রমে [illegible] ইন্স্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। ভূদেববাবু একজন খাঁটী বাঙ্গালী এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের অনুশাসন ও দেশীয় রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি অমূল্য পুস্তকসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার শিক্ষার মূলে গভীর নিষ্ঠা, উদার স্বদেশপ্রেম এবং তীব্র আত্ম-সম্ভ্রম দেদীপ্যমান্। তিনি দেশে সংস্কৃতচর্চ্চার নিমিত্ত প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ।

পৃঃ ৩৮। মনুষ্য-সাধারণ-ধর্ম্ম—সমগ্র মানবজাতির অবলম্বিত ও পালিত ধর্ম্ম; যে সকল গুণ ও সংস্কার জাতিনির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রকার লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষীভূত—যাহা পূর্ব্বে নয়ন-গোচর হয় নাই, এক্ষণে হইয়াছে।

সমবায়ে—মিলনে।

পৃঃ ৩৯। মনুজ—মানব (মনু+জন্+ড)।

পতন-প্রবণ-জাতি—যে জাতির পতনের সূত্রপাত হইয়াছে বা শীঘ্র হইবে।

সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী—যে উদ্দেশ্যে সমাজ গঠিত সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধির অনুকূল।

পৃঃ ৪০। ইন্দ্রিয়গ্রাম—ইন্দ্রিয়সমূহ।

অববোধ—জ্ঞান, অনুভব।

কৃতি-সামর্থ্য—কর্ম্মক্ষমতা।

অনৃত—মিথ্যা।

পৃঃ ৪২। ক্ষুদ্রাশয়—(আশয় অভিপ্রায়, বাসনা) অল্পে সন্তুষ্ট, সামান্য বিষয়ে লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন।

অনুচিকীর্ষা—অনু-সদৃশ বা পশ্চাৎ, চিকীর্ষা (কৃ+সন্+ইচ্ছার্থে অ) অনুকরণ করিবার ইচ্ছা।

পৃঃ ৪৩। আস্পদ—আধার।

বীরত্বে কাতরতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত—কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশজাত। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইনি ডিভিসনাল কমিশনারের পদে উন্নীত হন এবং বিশেষ কুশলতার সহিত শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি কিছুকাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বরোদার রাজস্বসচিবের পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ; এবং পরিশেষে তথায় প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। ভারতবর্ষীয় অর্থনীতির দুরূহ সমস্যার আলোচনা ও সমাধানে রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশে অদ্বিতীয়। জটিল শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ নামক তাঁহার উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" স্থাপিত হইলে ইনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। ইঁহার রচনা প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ এবং মার্জ্জিত।

পৃঃ ৪৫। ভাগগ্রাহী—অংশ-গ্রহণকারী।

স্বামিধর্ম্ম—প্রভুর প্রতি পালনীয় ধর্ম্ম।

পৃঃ ৪৭। সম্বল—পাথেয় ; সংস্থান।

কলত্র—স্ত্রী।

রোরুদ্যমান—সাতিশয় রোদনশীল (রুদ্ + যঙ্ + শান)।

পৃঃ ৪৮। কন্দর—পর্ব্বত-গুহা।

ঈশানী—ভগবতী, দুর্গা।

কীটাণু।

পৃঃ ৫০। নভোমণ্ডল—আকাশ।

মর্ত্ত্যস্থল—পৃথিবী।

কথাসরিৎসাগর—কাশ্মীরপতি শ্রীহর্ষদেবের সময়ে সোমদেব ভট্ট নামক একজন [illegible] মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত এই গ্রন্থ রচনা করেন। কৌশাম্বী নরপতি উদয়নের পুত্র নরবাহন দত্তের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে বর্ণিত আছে।

অখিল—সমগ্র।

বিস্ময়ার্ণব—বিস্ময়সমুদ্র।

পৃঃ ৫১। জলব্যাল—সর্প, জলঢোঁড়া সাপ।

পৃঃ ৫৩। কুর্দ্দন—ক্রীড়া।

স্থাবর—অচল, স্থিতিশীল।

জঙ্গম—গমনশীল।

জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল—গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি।

পৃঃ ৫৪। অবিনশ্বর—অক্ষয় অবিনাশী।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—সংস্কৃত ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত বহু গ্রন্থে গভীর ও জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম সুপরিস্ফুট।

পৃঃ ৫৫। স্বায়ত্ত—স্ববশে আনয়ন, গ্রন্থে লিখিত ভাবগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝা।

স্ফূর্ত্তি—বিকাশ।

পৃঃ ৫৬। ধী—বুদ্ধি মেধা, ধারণা করিবার ক্ষমতা। স্মৃতিশক্তি।

সম্মার্জ্জন—অনুশীলন।

উদ্বোধিত—জাগরিত।

দুর্নিবার্য্য—যাহা নিবারণ করা যায় না।

পৃঃ ৫৭। আত্মোৎকর্ষ—আপনার উন্নতি।

পৃঃ ৫৮। অনুবর্ত্তন—পশ্চাৎ গমন।

প্রতীত—জ্ঞাত।

সাধারণের উন্নতি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—চুঁচুড়ায় জন্ম। ইনি বঙ্কিমের সমসাময়িক, অধুনা-বিলুপ্ত "নবজীবন" ও "সাধারণীর" সম্পাদক। ইঁহার রচনার প্রধান গুণ প্রাঞ্জলতা এবং সরসতা। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সাহিত্য-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন।

ভূদেব বাবুর ন্যায় ইনিও স্বদেশের ও সমাজের প্রাচীন রীতিনীতির সমর্থক ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল এই বরেণ্য সাহিত্যিক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

পৃঃ ৫৯। নিগূঢ়—অপ্রকাশিত, গুপ্ত, জটিল।

দায়—উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধন।

বাজারু—বাজে; অসার; বাজার-চলিত।

পৃঃ ৬১। সম্প্রসারণ—বিস্তৃতি।

সীতাপতি গোস্বামী কে ?

পৃঃ ৬৩। অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ, সামান্য।

নির্ব্বন্ধ—ব্যবস্থা, নিয়ম।

সীতাপতি গোস্বামী—শিবজীর বিশ্বস্ত সেনানী রঘুনাথজী হাবিলদার; ইনি শিবজী কর্ত্তৃক বিনাদোষে বিতাড়িত হইয়াও ছদ্মবেশে দিল্লীতে শিবজীর উদ্ধারের নিমিত্ত দুঃসাহসিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাল্মীকির জয়। (১)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নৈহাটির বিখ্যাত অধ্যাপক-বংশে ইঁহার জন্ম। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভার ইঁহার উপর অর্পিত। শাস্ত্রী মহাশয় বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত। "বাল্মীকির জয়" শাস্ত্রী মহাশয়ের অল্প বয়সের রচনা। কল্পনায়, ভাবের পারিপাট্যে ও ভাষার সৌন্দর্য্যে এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় [illegible]

[illegible] প সহ ছায়াপথ—রাত্রিকালে আকাশে যে অস্ফুট আলোকবিশিষ্ট শুভ্র[illegible] দৃষ্ট হয় তাহাই ছায়াপথ; বহুদূরবর্ত্তী তারকাপুঞ্জের আলোকই শ্বেতবর্ণ পথের [illegible] ছিলেন।

ধুন্ধূলার—পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে, তাহার নাম ধুন্ধূলা।

পৃঃ ৬৮। খড্—দুই পাহাড়ের মধ্যের ব্যবধান, নিম্ন উপত্যকা।

উপল—শিলা।

সন্ধি—মিলন।

দ্বিধা—দুই ভাগে।

চিত্রার্পিত—চিত্রে স্থাপিত, চিত্রপটে লিখিত, ছবিতে আঁকা।

ঋভু—যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য্য করিয়া দেহত্যাগ করেন, বেদমতে তাঁহারা 'ঋভু' হন।

পৃঃ ৬৯। টিব্যায—পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়ীরা টিব্যা বলে।

দ্বিফাল—দ্বিধাবিভক্ত।

পৃঃ ৭০। চতুরুদধি—চারি সমুদ্র (উদধি=সমুদ্র)।

নীহার—তুষার।

ভাবগ্রহ—তাৎপর্য্য গ্রহণ।

পৃঃ ৭০। তন্ময়—(তৎ+ময়) নিবিষ্টচিত্ত, তদ্গত ভাবে।

আত্মপ্রসাদ—কোন সৎকর্ম্ম করিলে আপনার উপর যে প্রসন্নতা জন্মে, মনে যে সুখ-সঞ্চার হয়।

আত্মগ্লানি—অসৎকর্ম্মের ফলে মনে যে ধিক্কার জন্মে।

বাল্মীকির জয়। (২)

পৃঃ ৭১। অন্তর্দ্দাহ—মন পুড়িয়া যাওয়া; অনুশোচনার [illegible] ক্লেশ।

উদ্বেল—(উৎ—অতিক্রান্ত, বেলা সীমা) উথলে উঠা, উচ্ছ্বসিত।

পৃঃ ৭২। ক্রৌঞ্চমিথুন—ক্রৌঞ্চ-দম্পতি।

পৃঃ ৭৩। [illegible]

নয়নাসার—[illegible]।

সহৃদয়তা—আন্তরিকতা।

পৃঃ ৭৪। দরদ—বেদনা; দুঃখ।

চরিত্রে।

রজনীকান্ত গুপ্ত—বাল্যকাল হইতেই রজনীকান্ত গুপ্তের বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যাইত। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি 'জয়দেব-চরিত' লিখিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তজ্জন্য তিনি অভিভাবকগণের ইচ্ছা সত্ত্বেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস," "আর্য্যকীর্ত্তি," "ভারতপ্রসঙ্গ," "ভীষ্মচরিত," "বীরমহিমা," "প্রতিভা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শক। 'তাঁহার সকল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়, তাহা তাঁহার স্বজাতির অতীত মহিমার কীর্ত্তন, এবং জাতীয় আত্মসম্মানবোধের উদ্বোধন।' জন্ম ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ; মৃত্যু ১৯০০ খ্রীঃ অব্দ। রজনীকান্তের ভাষা সুমার্জ্জিত, ওজস্বিতা, সুস্পষ্টতা এবং শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ।

পৃঃ ৭৬। সক্রেটিস্—প্রাচীন গ্রীস দেশের অসাধারণ পণ্ডিত, প্লেটো, এরিষ্টটল্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের গুরু, পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় দার্শনিকগণের প্রাণস্বরূপ। গভীর জ্ঞানে, উদারচিত্ততায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে তিনি চিরকাল মানবসমাজের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। তিনি কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই, মৌখিক শিক্ষা দ্বারা তৎকাল-প্রচলিত রীতি নীতি ও ভ্রান্ত মতবাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিকতা প্রভৃতির অভিযোগ আনা হয়। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। বীরের [illegible] সানন্দে তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁ[illegible] আত্মার অমরতা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব সামগ্রী। [illegible]সহ ছা[illegible]৬৯ অব্দ; মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দ।

[illegible]হয় তাহল্ল—মিবারের অধিপতি। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল টোডার অধিপতি [illegible]। [illegible]র কন্যা তারাবাইএর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হন। সুরতন তখন পাঠান কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি পাঠান হস্ত হইতে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, তিনিই তারাবাইকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন। পাঠানের সহিত যুদ্ধে জয়মল্ল পরাজিত হইয়া রাজপুত গৌরব ভুলিয়া

গিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং অবৈধরূপে সুরতন-কন্তাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন। রাও সুরতন জয়মল্লকে নিহত করিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করিলেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে মহানুভব রায়মল্ল সুরতনের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না। অধিকন্তু পুত্রহন্তাকে রাজ্যদানে পুরস্কৃত করিয়া রাজপুত-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

পৃঃ ৭৭। শ্রদ্ধাসহকৃত—শ্রদ্ধার সহিত।

অনুজীবী—আশ্রিত, পোষ্য, ভৃত্য।

গুহক চণ্ডাল—ইনি একজন ব্যাধ ছিলেন। বনবাস কালে রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের জটা বাঁধিয়া দিয়া, বল্কল প্রস্তুত করিয়া এবং নৌকার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করেন। বনবাস শেষ হইলে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে গুহকের সাক্ষাৎ হইলে,রামচন্দ্র তাঁহার সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পৃঃ ৭৮। প্রস্তর-দ্রবে—গলিত-প্রস্তরে।

অলোকসামান্য—অসাধারণ।

পল্লীগ্রামে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি, অতুল-মনীষা-সম্পন্ন, চিন্তাশীল লেখক। রবীন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। অতি বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার কবিতা লিখিবার শক্তির বিকাশ হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইতেই তিনি "ভারতী"তে লিখিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। গানে, ভাবপূর্ণ কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, সাম[illegible] রাজনৈতিক প্রবন্ধে, সাহিত্য-সমালোচনায় এবং ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনায় সর্ব্বত্র [illegible] প্রতিভা ও গভীর চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট। তাঁহার গানগুলি শিক্ষিত বাঙ্গা[illegible] স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অঞ্জলি ভরিয়া [illegible] ভাবসম্পদ পাশ্চাত্যকে দান করিয়াছে।

সম্প্রতি ইনি "নোবেল" প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পৃঃ ৮২। সুষমা—শোভা।

পৃঃ ৮৩। কুমুদ—শেয়ালাফুল, শালুক।

কহ্লার—পদ্ম।

রামায়ণ।

পৃঃ ৮৪। কাব্যহর্ম্ম্য—কাব্যরূপ প্রাসাদ।

পৃঃ ৮৬। জিগীষা—জয় করিবার ইচ্ছা।

শান্তরসাস্পদ—শান্তরসের আস্পদ অর্থাৎ আধার, স্থান।

পৃঃ ৮৭। আপামরসাধারণ—আপামর, পামর পর্য্যন্ত। সর্ব্বসাধারণ।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ—অষ্টাক্ষর ছন্দ বিশেষ।

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য।

পৃঃ ৮৯। বৈষম্য—বিচ্ছেদ, সাম্যের বিপরীতার্থ বোধক।

সম্প্রসারণ—বিস্তার।

দক্ষিণাপথ—দাক্ষিণাত্য।

উপনিবিষ্ট—স্থাপিতোপনিবেশ।

পৃঃ ৯০। শ্রমণ—বৌদ্ধ ভিক্ষু।

চৈত্য—বৌদ্ধগণের উপাসনার স্থান।

পৃঃ ৯১। অধঃকৃত—পরাভূত।

পৃঃ ৯৩। বালীদ্বীপ—বালী নহে, প্রকৃত পক্ষে 'বলী'দ্বীপ যবদ্বীপের পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ...কা প্রবন্ধ দেখ।

... দ্বীপ। যবদ্বীপের (Java) পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ...কা প্রবন্ধ দেখ।

বরাহমিহির—সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ...হয় তাহাঁনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ...গ তাঁহার মৃত্যু হয়। কাহারও কাহারও মতে বরাহ ও মিহির দুই ব্যক্তি, ...পিতা ও পুত্র। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম বৃহৎ সংহিতা।

আর্য্যভট্ট—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, কুসুমপুরে ৪৭৬ খ্রীঃ অঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর গোলত্ব ও আহ্নিকগতি আবিষ্কার করেন।

ভাস্করাচার্য্য—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যে ইঁহার জন্ম। "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" ভাস্করাচার্য্যের প্রধান পুস্তক। ইঁহার পাটীগণিত অধ্যায় তাঁহার কন্যা লীলাবতী নামে অভিহিত। কেহ কেহ অনুমান করেন লীলাবতীই এই অংশের রচয়িত্রী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিতের বহু নূতন সমস্যার সমাধান আছে। অন্যান্য অধ্যায়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত আছে। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের একমাত্র কন্যা, পিতার যত্নে ও চেষ্টায় সুশিক্ষিতা, গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিনী।

পৃঃ ৯৪। চরক ও সুশ্রুত—সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-লেখক দ্বয়। ইঁহারা ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর নিয়ন্তা।

অমর সিংহ—বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। 'অমরকোষ' নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান ইঁহার সঙ্কলিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী—যৌবনে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরিত হন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে এবং হিন্দু দর্শনে সুপণ্ডিত। ইঁহার বক্তৃতাগুলি ধর্ম্মতথ্য ও উচ্চ ভাবপূর্ণ। তাঁহার সকল রচনাতেই গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। "মেজবউ," "নয়নতারা," "বিধবার ছেলে" প্রভৃতি উপন্যাস এবং কতকগুলি কবিতা ইনি রচনা করিয়াছেন। ইঁহার "প্রবন্ধাবলি" বাঙ্গালা ভাষার একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

পৃঃ ৯৫। তুঙ্গ—উচ্চ।

আভ্যন্তরীণ—ভিতরকার।

অশনি—বজ্র।

অরণ্যানী—বৃহৎ বন।

পৃঃ ৯৭। খদ্যোত—জোনাকী।

বিশ্বাত্মা—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত ভগবানের সত্তা।

পৃঃ ৯৯। বিমূর্চ্ছিত—অবসন্ন, অবশিষ্ট।

ধর্ম্মাবহ—ধর্ম্মাবহ ধর্ম্ম + আবহ (=জনক, উৎপাদক, বহনকর্ত্রী)।

পৃঃ ১০১। সার্ব্বভৌমিক—সকল দেশ ও সকল জাতিতে বিস্তৃত।

সার্ব্বজনীন প্রেম—যে প্রেম পৃথিবীর সকল লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্মশানে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—ইনি বাঙ্গালার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। বঙ্গদর্শনের যুগেই ইঁহার রচনা সমাদৃত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার ভাষা হৃদয়গ্রাহী। সরস ও সুন্দর উপমার সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য সুপরিস্ফুট।

পৃঃ ১০২। নৈসর্গিক—প্রাকৃতিক।

ঈশা—যীশু।

রুসো—প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক, সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক।।

যে অনভিভবনীয় ইত্যাদি—আলেকজাণ্ডার, ভারতবর্ষে সেকেন্দর সাহ নামে বিদিত।

যে উৎকট আত্মাভিমান...—আগষ্ট কোমৎ। Comte

যে চিন্তাশক্তি...—জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

যে সৌন্দর্য্য...—সীতা।

লাবণ্যবজ্জু—মিশর-রাণী ক্লিওপ্যাট্রার সৌন্দর্য্য।

পৃঃ ১০৪। আধিভৌতিক—পঞ্চভূত এবং প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন।

আধিদৈবিক—দৈবজাত।

ব্রীড়া—লজ্জা।

পৃঃ ১৩৫। প্রতিক্ষেপ—তিরস্কার; বিপ্রকর্ষণ (আকর্ষণের বিপরীত)

পৃথিবীর বয়স।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, সাহিত্য,

দর্শন, বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত, বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখক, বঙ্গভাষার অক্লান্তসেবক। ইনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ "জিজ্ঞাসা," "প্রকৃতি," "মায়াপুরী" গ্রন্থে সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "চরিতকথা" ভারতবর্ষীয় কর্ম্মিগণের চরিত্রের নিপুণ সমালোচনা। এতদ্ব্যতীত তিনি "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" গ্রন্থের সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" ত্রিবেদী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইনি পরলোকগত হইয়াছেন।

পৃঃ ১০৭। লোল—শিথিল।

বাতুলতা—পাগলামি।

প্রাজ্ঞ—বুদ্ধিমান্।

পৃঃ ১০৮। বিন্যাস—রচনা, সজ্জাপ্রণালী।

পৃঃ ১০৯। জীবধর্ম্মা—প্রাণিধর্ম্মাবলম্বী।

বন্ধুর—অসমতল।

অভিব্যক্তি—প্রকাশ।

সুরধুনী—গঙ্গা।

অপনোদন—দূরীকরণ।

পৃঃ ১১০। হক্সলি—সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও জীবতত্ত্ববিদ্।

আরণ্য—অরণ্যজাত।

পৃঃ ১১২। লর্ড কেল্‌বিন্—সুবিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ্যাবিদ্। ইঁহার আবিষ্কার পদার্থবিদ্যায় (physics) যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

আবর্ত্তন—ঘোরা।

ভূয়োদর্শন—পুনঃ পুনঃ দেখা, পর্য্যবেক্ষণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পৃঃ ১১৪। বাগ্‌যত—স্বল্পভাষী।

অব্যাহত—অপ্রতিহত, বিঘ্নশূন্য।

পৃঃ ১১৬। বিক্ষোভিত—আন্দোলিত, চঞ্চল।

পৃঃ ১১৮। প্ররোচনা—তাড়না, উৎসাহ।

যুগপৎ—একই সময়ে, একসঙ্গে।

ভীম—ভীষণ, রুদ্র।

কান্ত—সৌম্য।

অধৃষ্য—অপরাজেয়; যাহার নিকট যাইতে ভয় হয় এরূপ।

অভিগম্য—গমনযোগ্য।

পৃঃ ১১৯। সানুমান—পর্ব্বত।

সীতা।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—ইঁহার রচিত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" "অহল্যাবাই," "পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য" বঙ্গসাহিত্যে সমাদৃত। ইঁহার রচনা গাম্ভীর্য্য ও শব্দযোজনাচাতুর্য্যে সমৃদ্ধ। মাইকেল-জীবনী বঙ্গ-সাহিত্যে চরিতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত "সীতা" মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত হইতে গৃহীত।

পৃঃ ১২১। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী—স্বর্ণ প্রাসাদরূপ কিরীট (মুকুট)-শোভিতা; বহু সমুচ্চ, মনোহর স্বর্ণনির্ম্মিত সৌধযুক্তা।

কুসুমদাম—ফুলের মালা।

মনোজ্ঞ—মনোহর।

পৃঃ ১২২। বীচি—তরঙ্গ।

অ[illegible]ঋষি-প্রণীত।

[illegible] সহ [illegible] কুলায়—নীড়।

[illegible] হয় [illegible]—স্তুতিপাঠক, বন্দী, বন্দনাকারী।

পৃঃ ১২৪। কুবলয়—পদ্ম।

সরসী—সরোবর।

মঞ্জরিত—পুষ্পিত।

সহকার—আম্রবৃক্ষ।

মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ।

শশধর রায়।—ইনি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; বহু বৎসর নানা মাসিকপত্রে বঙ্গ ভাষায়, প্রধানতঃ সমাজতত্ত্ব (sociology) সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রায়মহাশয়ের সমাজতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞান ; তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং কৃত্রিমতা-দোষ-বর্জ্জিত। তাঁহার প্রবন্ধসমূহ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বন্যযুগের আদিম বর্ব্বরতা হইতে মনুষ্যজাতি কিরূপে ক্রমে ক্রমে সভ্যতার উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পৃঃ ১২৬। সামাজিক গুণ—যে সকল গুণ সাধারণের উন্নতির অনুকূল।

ক্রমবিবর্ত্তিত—ক্রমোন্নত। মনুষ্যজাতি ক্রমে ক্রমে নিম্নতর অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা লাভ করিতেছে, এই সিদ্ধান্তের নাম বিবর্ত্তনবাদ।

পৃঃ ——— শ্রমের অভাব—অধিকতর মানসিক উন্নতির নিমিত্ত একান্ত আগ্রহ।

পৃঃ ১৩০। ভাববিনিময়—পরস্পর যাহা ভাবে ও চিন্তা করে তাহার আদান প্রদান।

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কাল কলিকাতা হাইকোর্টের জজ এবং দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইনি ১৯১৮ সালের ২রা ডিসেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার ভাষা সরল এবং বক্তব্য বিষয় ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারী।

পৃঃ ১৩২। শরীরমাদ্যং........অগ্রে শরীর সুস্থ রাখিবে, তৎপরে ধর্ম্মসাধন করিবে।

পৃঃ ১৩৩। পণ্ডিত-মূর্খ—ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও সাধারণ-বোধশূন্য।

পৃঃ ১৩৪। চাণক্য—অসাধারণ কূট-রাজনীতি-বিশারদ। ইঁহার কূট নীতির প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। চাণক্য-শ্লোকসমূহ সরল ও গভীর নীতিপূর্ণ।

হৃষীকেশ।

জলধর সেন—১৩৭৮ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে জন্ম। ইনি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সাহিত্য-শিষ্য। জলধর বাবু তাঁহার হিমালয়ে পর্য্যটন-কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা এবং বর্ত্তমানে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক। ইঁহার রচনা সরস, মধুর এবং শান্ত ও করুণ ভাবের প্রাচুর্য্যে হৃদয়গ্রাহী। এই প্রবন্ধ "হিমালয়" নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পৃঃ ১৩৭। ভাস্কর বিদ্যা—প্রস্তরাদিতে ক্ষোদন-কার্য্যে অভিজ্ঞতা।

শঙ্করাচার্য্য—৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শঙ্করের যুক্তির প্রভাবে বৌদ্ধগণ পরাস্ত হন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। ইনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তবাদ প্রচার করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

পৃঃ ১৩৮। সদাব্রত—অতিথি, অভ্যাগত ও সন্ন্যাসীরা প্রত্যহ আহার্য্য [illegible] সম্পেরূপ ব্যবস্থা।

পৃঃ ১৪০। নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান।

উটজ—তৃণ-নির্ম্মিত কুটীর।

আলবাল—বৃক্ষমূলে বেষ্টিত জলাধার।

পরিশ্রমের মর্য্যাদা।

এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

পৃঃ ১৪৪। আভিজাত্য—বংশমর্যাদা, কৌলিন্য।

এব্রাহাম্ লিঙ্কন—(মূল গ্রন্থ দেখ।)

গ্লাড্ষ্টোন—ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদারনৈতিক প্রধান মন্ত্রী। (Liberal)

ডিকেন্স—সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক।

পৃঃ ১৪৫। যন্ত্রবিজ্ঞান—Mechanics.

রসায়ন—Chemistry.

পদার্থ বিদ্যা—Physics.

পিটার দি গ্রেট্—মূল গ্রন্থ দেখ।

পৃঃ ১৪৬। কারলাইল—সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যবিদ্।

পৃঃ ১৪৭। উপনিবেশ—কোন দেশের কতকগুলি লোকের অন্য দেশে স্থায়ীভাবে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের আয়োজন করিয়া বসতি স্থাপনের নাম উপনিবেশ।

ইউরোপে সারাসেন সভ্যতা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সুলেখক। মজুমদার মহাশয় বিগত কয়েক বৎসরকাল অক্লান্ত ভাবে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। ইঁহার নানা শাস্ত্রে [illegible]ধারণ পাণ্ডিত্য; ভাষা মার্জ্জিত ও সুস্পষ্ট।

পৃঃ ১৫০। সারাসেন্—মুসলমানেরা, সাধারণতঃ [illegible] এই নামে অভিহিত হইতেন।

মুর—আফ্রিকার মরক্কো প্রভৃতি ভূখণ্ডের আরব অ[illegible] 'মুর' নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা ৭১১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৯২ অব্দ পর্য্যন্ত স্পেনদেশ আপনাদের শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন।

পৃঃ ১৫১। শারলেমন্—চার্লস দি গ্রেট্; ফ্রাঙ্কদিগের অধিপতি এবং রোমের সম্রাট; প্রসিদ্ধ বীর, যোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী।

খালিফ্—মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণের আখ্যা।

পৃঃ ১৫১। সুলতান আব্দর রহমান্—সারাসেনদিগের অধিনায়ক, কর্ডোভার প্রথম খলিফা।

পৃঃ ১৫৩। কর্ডোভা—স্পেনদেশের নগর।

জৈবক্রিয়া—জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। জীব+ষ্ণ=জৈব।

বন ও

জগদানন্দ রায়—ইনি বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ভাষা সরল এবং বিষয়ের উপযোগী।

পৃঃ ১৫৬। বাত্যা—ঝটিকা, ঝড়।

বাণিজ্যবায়ু—এই বায়ুপ্রবাহ হইতে বাণিজ্য পোতসমূহ বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

পৃঃ ১৫৭। প্রতিহত—বাধা প্রাপ্ত।

পৃঃ ১৫৮। বিসদৃশ—বিপরীত।

পৃঃ ১৫৯। জৈবক্রিয়া—জীবন ধারণের উপযোগী কার্য্য।

নিশীথে আগন্তুক।

"জীবন ৩৮। সদ্যত সঙ্কলিত। শিবজী যখন দিল্লীতে বন্দী, সেই সময়ের কথা অবলম্বন রূপ ব্যবস্থা।

পৃঃ ৬০। নাগরাখানা—নাগরা—বাদ্যযন্ত্র।

বিভূতি—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি, এখানে ভস্ম।

পৃঃ ১৬২। রায়গড়—শিবজীর সুবিখ্যাত পার্ব্বত্য দুর্গ।

পৃঃ ১৬৩। নিদর্শন—চিহ্ন, প্রমাণ।

বর্ম্ম—কবচ, সাঁজোয়া।

তূণ—বাণাধার।

পৃঃ ১৬৪'। রঘুনাথ পন্থ—শিবজীর বিশ্বস্ত সুহৃদ্‌ এবং সুদক্ষ সহকর্ম্মী।

সাগরিকা।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্ম; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। ইঁহার গভীর গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফলে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গের, অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সাধারণের গোচরে আসিয়াছে। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া বিবিধ মাসিকপত্রে ইঁহার মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয় উচ্চশ্রেণীর লেখক। তাঁহার ভাষা ওজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতাগুণে হৃদয়গ্রাহী।

পৃঃ ১৬৭। বৃহত্তর ভারতবর্ষ—"Further India", এই সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইতিহাসের পূর্ব্ববর্তন যুগ—"Pre-historic age", যে সময়ের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না; প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

পৃঃ ১৬৮। মঙ্গোলীয়—নৃতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা এশিয়ার পীতজাতীয় লোক-গণকে এই আখ্যায় অভিহিত করেন। মঙ্গোলীয়া হইতে এই নামের উৎপত্তি।

ককেশীয়—নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মানবজাতির এক বিভাগকে এই নামে অভিহিত করেন। ইউরোপীয়, ভারতীয়, জার্ম্মেণীয়, ইহুদী এবং পারসিক [illegible] অন্তর্গত। ককেশস্‌ পর্ব্বত হইতে এই নামের উৎপত্তি।

প্রত্নতত্ত্ব—পুরাকালের ইতিহাস।

লক্ষ্মণ।

দীনেশচন্দ্র সেন। ১২৭৮ বঙ্গ অব্দে ঢাকা জেলায় ইঁহার জন্ম। বর্ত্তমান সময়ে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার "রিডার"। বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের

ফলে "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" নামক বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের একখানি সুবৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক এবং শক্তিশালী লেখক। ইঁহার ভাষা সর্ব্বত্রই বিষয়ের উপযোগী। ওজস্বিতা, মাধুর্য্য, প্রাঞ্জলতা এবং সুস্পষ্টতা প্রভৃতি গুণে দীনেশচন্দ্রের রচনা বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রবন্ধ "রামায়ণী কথা" হইতে সঙ্কলিত।

পৃঃ ১৭২। জটিল—বিবিধ এবং বিরোধী গুণ যুক্ত সংযমের অবস্থা। Complex.

পৃঃ ১৭৪। পরিব্রজ্যা—সন্ন্যাস, সর্ব্ববিধ সংযমের অবস্থা।

সপ্তপর্ণ—ছাতিম গাছ।

পৃঃ ১৭৫। সপ্তচ্ছদ - ছাতিম গাছ ; ছদ—পত্র।

বন্ধুজীব—বাঁধুলি ফুলের গাছ।

গিরিসানুদেশ—পর্ব্বতের উপরের সমতল ভূমি।

পৃঃ ১৭৬। কাঞ্চী—মেখলা, চন্দ্রহার।

কিরীটেশ্বরী।

নিখিলনাথ রায়—২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রামে জন্ম। ইনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। ইঁহার রচনা সরল, আড়ম্বরশূন্য এবং সুস্পষ্ট। এই প্রবন্ধ "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" হইতে সঙ্কলিত।

পৃঃ ১৮০। উপপীঠ—পীঠ স্থানের নিম্নস্তরের পবিত্রস্থান।

বঙ্গাধিক[illegible]রিগণ—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জমিদার বংশ, ইঁহারা পদমর্য্যাদার জন্য এই উ[illegible]রেন।

[illegible]। সদা[illegible]দেব-সেবাকল্পে দত্ত সম্পত্তি।

[illegible] ব্যবস্থা।

কা[illegible]নী[illegible] যে কর্ম্মচারী গ্রামের জমা ইত্যাদির হিসাব রাখেন। Village-registrar.

পৃঃ ১৮৪। ভবানী—রাণী ভবানী।

মনস্থরের তত্ত্বজ্ঞান লাভ।

মোজাম্মেল হক্—নদীয়ানিবাসী মুসলমান সাহিত্যসেবক। ইঁহার রচনা সুমার্জ্জিত, সুললিত এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ।

"মহর্ষি মনসুর" হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত।

মনসুর—ইনি যোগ-সাধনার দ্বারা 'আনাল্ হক্' 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইনি অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া দেহত্যাগ করেন।

ধর্ম্মসঙ্গীতি।

চারুচন্দ্র বসু—ইনি "ধর্ম্মপদ" নামক প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। ইঁহার 'অশোক' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। চারুবাবুর রচনা সরল ও বিষয়ের উপযোগী।

পৃঃ ১৮৯। উরুবিল্ব—বুদ্ধ এই স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

কুশীনগর—গোরক্ষপুরের সন্নিকট।

মহাপরিনির্ব্বাণ—শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ; জীবনের সকল অবস্থা পার হইয়া নিবৃত্তি লাভ।

মহাকাশ্যপ—বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ইনি বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।

সুগত—বুদ্ধদেবের অপর নাম।

১৯০। রাজগৃহ—বর্ত্তমান 'রাজগির'; বিহারের অন্তর্গত।

আনন্দ—বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ও প্রিয়তম শিষ্য।

অর্হৎ—সিদ্ধপুরুষ।

অজাতশত্রু—ইনি মগধের রাজা ছিলেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন পরে বৌদ্ধমত অবলম্বন করেন।

বৈভারপর্ব্বত—রাজগৃহের অন্তর্গত পর্ব্বত; বিহার প্রদেশের মধ্যে।

ভিক্ষু—Monk; বৌদ্ধসন্ন্যাসী।

১৯১। পিটকত্রয়—বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম এই তিন অংশে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ।

উপালি—বুদ্ধদেবের জনৈক ভক্ত শিষ্য।

ঋদ্ধিপাদ—সিদ্ধপদ।